চিঠি

মুনীর চৌধুরী

চিঠি

মুনীর চৌধুরী

ভূমিকা

শামস্ আল্‌দীন
বাংলা বিভাগ
উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

প্রথম শোভা প্রকাশ মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (তৃতীয় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৮৭৪

স্বত্ব
লিলি চৌধুরী

প্রচ্ছদ
সুখেন দাশ

কম্পোজ
সোলার কম্পিউটার

মুদ্রণ
জমজম প্রিন্টার্স

দাম
১৫০ টাকা

I S B N 984 7084 0316 4

Chiti by Munir Chowdhury Published by Mohammad Mizanur Rahman of Shova Prokash 38/4 Mannan Market 2nd Floor Banglabazar, Dhaka 1100. Price : Taka One Hundred Fifty Five only.

শোভা প্রকাশের কোন বই অনলাইনে অর্ডার করতে
www.rokomari.com ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ৭

মূল নাটক : চিঠি

প্রথম অঙ্ক ২৩

দ্বিতীয় অঙ্ক ৫২

তৃতীয় অঙ্ক ৭৪

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : জীবনপঞ্জি ৯৩

পরিশিষ্ট-২ : গ্রন্থপঞ্জি ৯৫

ভূ মি কা

বাংলাদেশের সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে মুনীর চৌধুরী সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ। মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) শুধু একটি নাম নয়, ইতিহাস। অসাধারণ এবং অসম্ভব রকমের এক প্রতিভার নাম মুনীর চৌধুরী। তাঁর প্রতিষ্ঠার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল শিক্ষকের আদর্শবাদিতা, নিষ্ঠা, সফল নাট্যপ্রতিভা ও সমাজ-চেতনার সমৃদ্ধি। জীবনের ছেচল্লিশ অধ্যায়ে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে মুনীর চৌধুরী নিহত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত শহীদদের মধ্যে অন্যতম মুনীর চৌধুরী। তাঁর চেতনায় সর্বদা লালিত হয়েছে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঘটনাপ্রবাহসহ বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সংগ্রামী চেতনা। তিনি ব্যক্তি জীবনে অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন, ছিলেন মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল।

আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী পূর্ণাঙ্গ নাম মুনীর চৌধুরী। মুনীর চৌধুরীর জন্ম মানিকগঞ্জে। বাবা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী (১৮৯২-১৯৭০)। তাঁর বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। মুনীর চৌধুরী চৌদ্দ ভাই-বোনের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়। আবদুল হালিম পরিবারের চৌদ্দ সন্তানের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। কবীর চৌধুরী	২। মুনীর চৌধুরী
৩। নাদেরা বেগম	৪। নাসির চৌধুরী
৫। কাইয়ুম চৌধুরী	৬। রওশন আরা বেগম
৭। মঞ্জুর এলাহী	৮। দিলারা বেগম
৯। এ.এফ.এম. ইকবাল	১০। শমশের চৌধুরী
১১। ফেরদৌসী মজুমদার	১২। আখতার বানু
১৩। মাহবুব এলাহী ও	১৪। রাহেলা বানু

মুনীর চৌধুরী বড় ভাই কবীর চৌধুরী জীবনোপলব্ধি ও জ্ঞানস্পৃহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর বাবার বিদ্যানুরাগ মুনীর চৌধুরীকে সমুজ্জ্বল পথে এগিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছিল।

মুনীর চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতির আদর্শকে মান্য করতেন। ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সরদার ফজলুল করিমসহ বিদ্বজ্জনের প্রেরণায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বেশ কিছু সময় পর মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন। এর পেছনে রয়েছে মূলত তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা ও রাজনীতি সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাববোধ।

কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ১৯৪৯ সালে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে খুলনার ব্রজলাল কলেজে যোগদান করেন, তবে কিছুকাল সেখানে বাংলাও পড়িয়েছিলেন। কারাবরণ করেন মার্চে ঢাকায় এবং রাজনীতি করবেন না এ শর্ত দিয়ে তিনি কারামুক্তি লাভ করেন এবং এই বছরেই মুনীর চৌধুরী লিলি মীর্জাকে বিয়ে করেন।

মুনীর চৌধুরী জীবনের পথে চলা শুরু করলেন ধীরে ধীরে আরো বৃহৎ কলেবরে। তবে তিনি মা আফিয়া বেগমের (জন্ম–১৯০৮ খ্রি.) আদর্শিক পথকে মানসগঠনে অবলম্বন করেছিলেন।

> "১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) নাট্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, আনিস চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সাইদ আহমদ ও মুনীর চৌধুরী অন্যতম। চিন্তা-চেতনায় বা প্রতিভায় মুনীর চৌধুরী নাটকের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ষাটের দশকে প্রধানতম নাট্যব্যক্তিত্ব বলতে একমাত্র মুনীর চৌধুরীকে বুঝায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের নতুন জীবনভাবনা ও শিল্পবোধে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে যাঁরা সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটকের আধুনিক কলা-প্রকৌশল বাংলা নাটকে শিল্পিত স্বরগ্রামে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন, তাঁদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব। বিষয়বস্তু, জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলী এবং উপস্থাপনরীতির পরীক্ষায়, সাফল্য ও সিদ্ধিতে বাংলা নাটকের ধারায় মুনীর চৌধুরীর অবদান ব্যতিক্রমধর্ম চিহ্নিত। শিল্পবোধ ও জীবনচেতনার সপ্রতিভ এবং বিশ্ববিস্তারী মুনীর চৌধুরী প্রাতিস্বিক জীবনার্থ ঋদ্ধ, তপস্যাশুদ্ধ এবং আধুনিকতাস্পর্শী নাট্যকার।"
>
> (বাংলা নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর অবদান–মো. ফরহাদ হোসেন, পৃ. ৪৫)

অর্থাৎ নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর অবদান বাংলার স্বপ্নকে জাগরিত করেছে। আর এই জাগরিত উৎসের মূলে মানসগঠনের ভিত্তি তাঁকে দান করেছে সমৃদ্ধি। 'কবর' তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি নাটক। তাঁর পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'চিঠি' (১৯৬৬)। একাঙ্ক মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাজার জন্মদিন' (১৯৪৬), 'মানুষ' (১৯৪৭), 'পলাশী ব্যারাক' (১৯৪৮), 'ফিটকলাম' (১৯৪৮), 'আপনি কে?' (১৯৪৮), 'নষ্ট ছেলে' (১৯৫০), 'দণ্ড' (১৯৬২), 'দণ্ডধর' (১৯৬২) ও 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

তেমনি তাঁর অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রেও রয়েছে সমান গুরুত্ব। যেমনটি সাহিত্য সমালোচনা। তাঁর পূর্ণাঙ্গ (ক) মৌলিক নাটক ২টি, (খ) একাঙ্ক মৌলিক নাটক ২৪টি, (গ) অনুবাদমূলক পূর্ণাঙ্গ নাটক ৪টি, (ঘ) অনুবাদমূলক একাঙ্ক নাটক ৫টি, (ঙ) অসমাপ্ত অনুবাদ–রূপান্তরমূলক নাটক ৭টি, (চ) নাটকের খসড়া (অসমাপ্ত) ১টি।

নাট্যাচার্য রামেন্দু মজুমদার মুনীর চৌধুরীর অনুবাদ রূপান্তরমূলক রচনাগুলো প্রসঙ্গে বলেন–

> "মুনীর চৌধুরী আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভা। আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের তিনিই জনক। রাজার জন্মদিনে নাটিকায় মুনীর চৌধুরীর যে নাট্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, তা সার্থকতার সোপান বেয়ে বিকাশের এক পরিণত স্তরে পৌঁছেছিল ওথেলোতে। তাঁর এই উত্তরণের সাথে সাথে আমাদের নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে।
>
> (বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক–রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ২২৪)

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ–'ড্রাইডেন ও ডি এল রায়', 'মীর মানস', 'তুলনামূলক সমালোচনা', 'বাংলা গদ্যরীতি' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর সাতটি গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়–

(ক) নগ্ন পা

(খ) ফিডিং বটল

(গ) বাবা ফেকু

(ঘ) ন্যাংটার দেশ

(ঙ) খড়ম

(চ) একটি তালাকের কাহিনী

(ছ) মানুষের জন্যে

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী আরো নানা পরিচয়ে বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত–অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও বাগ্মী।

তাই মোহাম্মদ জয়নুদ্দীনের ভাষায় বলা যায়–

> 'যুক্তি, আবেগ, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, স্বাদেশিকতা, মানবিকতা ও বৈশ্বিক চেতনায় সমৃদ্ধ মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, যা আমৃত্যু চর্চিত সাধনার শিল্পিত ফসল। তাঁর এ শিল্পমানসগঠন ও জীবনবোধের স্বরূপ সৃষ্টিতে সক্রিয় ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা, সমকালীন আর্থসামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বিশ্ব শিল্প-সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য। এর মধ্যেই মুনীর চৌধুরী বেড়ে ওঠেন, নিজেকে গড়ে তোলেন এবং নির্মাণ করেন প্রদীপ্ত সাহিত্যসম্ভার।'
>
> (মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, পৃ. ১৪)

এক.

মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' তিন অঙ্কবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। মুনীর চৌধুরী কমেডিকে জীবনাচারণে স্থান দিয়েছিলেন। তারই সঠিক পরিচয় 'চিঠি' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকটিতে বিশুদ্ধ হাস্যরস, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা 'চিঠি' নাটকে বিচ্ছুরিত হয়েছে। কবীর চৌধুরীর মতে, "'চিঠি' বাঙলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন।" (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত থিয়েটার, পৃষ্ঠা ১৪৬) 'চিঠি' নাটকের পটভূমি ১৯৬২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নাটকের চরিত্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, প্রক্টর ও পুলিশ অফিসার প্রমুখ। সমগ্র নাটকটি কৌতুকাবরণে ঢাকা। নাটকটিতে স্থান পেয়েছে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তারিখ নির্ধারণ এবং তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের পিছনে অভিন্ন মতের ছাত্রদের প্রতি বাধাদান, মেধাবী ছাত্রের খাতা হারানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রণয়ঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রক্টরের পালনীয় কর্তব্যসহ হঠাৎই পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি 'চিঠি' নাটকে প্রহসনের পরিচয় দিয়েছে।

এছাড়া নাটকটিতে যুক্ত হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের প্রথম স্থান দখলের লড়াই, তাদের ভিতরের পারস্পরিক ঈর্ষা, অপছন্দের এবং প্রতিপক্ষের ছাত্রদের প্রতি পুলিশি হয়রানির মতো নীচতা ইত্যাদি। এ সমস্ত কিছুর ভিতরে নাট্যকারের নৈপুণ্যের চমৎকারিত্বও প্রকাশিত হয়েছে। যা নাট্যকারের দক্ষতা। রোম্যান্টিকতা-বর্জিত 'সোহরাব' 'চিঠি' নাটকের নায়ক, খালেদ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমিক, রমিজ আদর্শবর্জিত ছাত্রনেতা, সচেতনতায় বলীয়ান এই নাটকের নায়িকা মিস মীনা মিনহাজ, সদাচঞ্চল প্রকৃতির চরিত্র রুমা, পালনীয় কর্তব্যের প্রতি দায়িত্বসচেতন প্রক্টর হাসান ও পুলিশ অফিসার আসাদ। সকলেই এই নাটকে নিজস্ব গুণে উচ্ছল এবং উজ্জ্বল। এই সমস্ত কিছুর পাশাপাশি সংলাপ নির্মাণের কৌশল নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর দক্ষতাকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। এ কারণেই ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন, '–এ নাটকে প্রহসনের মেলা বসিয়েছে'। (পূর্বোক্ত–১৪৮)

দুই.

'চিঠি' নাটকটি মূলত ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। এই নাটকের কাহিনিতে দেখতে পাওয়া যায় সোহরাব, খালেদ ও তারেক তিন বন্ধু। সোহরাব মেধাবী ছাত্র, তার টিউটোরিয়াল খাতা মিস মীনা মিনহাজ তারেকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সমস্যাটা তৈরি হয় খাতাটির মধ্যে 'তাহমিনা' সম্বোধন করে একটি চিটি লেখা ছিল, যার মধ্যে প্রেমের ব্যাকুল আবেদন ছিল 'রুস্তম' ছদ্মনামে তারেকের। চিঠির লেখনী ছিল ক্রীড়ামোদী খালেদের। ফলে খাতাটি মিস মীনা

মিনহাজের কাছে যাওয়ার পড় থেকেই তিন বন্ধু অস্থির হয়ে পড়ে। সোহরাবের ভাবনা খাতাটি যেহেতু তার, সেহেতু মীনা মনে করতে পারে সোহরাব চিঠিটা লিখেছে। অপরপক্ষে মীনা মনে করতে পারে চিঠিটার লেখক খালেদ কিংবা তারেক। এসব কিছু মিলে তিনজনই উদ্বিগ্ন। ফলে ভোররাত পর্যন্ত তারা নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা করে। আবার ভাবনার কারণ হয় সোহরাবের টিউটোরিয়াল খাতার কারণে মীনা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে, মূলত সোহরাবের ক্ষুব্ধতার কারণ এটি। সমস্ত নাটক জুড়ে এমন দ্বন্দ্ব-কলহ বিদ্যমান। এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সংকট এবং পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ছাত্র আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎরতা লক্ষণীয়। এছাড়া চরিত্রসমূহের পারস্পরিক ঈর্ষা, জেদ, রাগ ও ক্ষোভের প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্তর্গত মনোজাগতিক আকর্ষণ কার্যকর হয়েছে। নায়ক-নায়িকার মুখে গরল উদ্‌গীরণ হলেও অন্তরে বেজেছে মধুর সুর। তাই নাটকের শেষ পর্যায়ে সোহরাবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে–

> 'আমি লিফলেটের রুস্তম নই, জলজ্যান্ত
> সোহরাব! তোমাকে ডাকছি, মীনা! মীনা!
> দরজা খোল। মীনা, দয়া করে আমার সব
> কথা শোন।' (মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১১৮)

আত্মহত্যা করতে উদ্যত মীনা বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়। ধীরে ধীরে সোহরাবের দিকে আসতে থাকে–নাটকেরও যবনিকা ঘটে।

তিন.

'চিঠি' নাটকের নায়ক সোহরাব। মুনীর চৌধুরীর সযত্নে সৃষ্ট এ চরিত্রটি। চরিত্রটির স্বাতন্ত্র্যতা মেধায় ও ব্যক্তিত্বে। পরীক্ষা পেছানোর বিরুদ্ধে সোহরাবের প্রতিবাদী ভূমিকা দৃঢ়তার সাথে ফুটে উঠেছে। প্রবল চাপ ও আন্দোলনের মুখেও সোহরাব থেকেছে দৃঢ় ও অনড়। রমীজ আমতলায় পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে এক জনসভার আয়োজন করে। অন্যান্য সহপাঠীরা রমীজকে সমর্থন করলেও সোহরাব কোনোভাবেই তা গ্রহণ করেনি। তাই তো প্রতিবাদের সুস্পষ্ট ভাষা নাটকে রূপ পেয়েছে।

> রমীজ। ওহ্! বেশ। আপনি বোধহয় খবর পেয়ে থাকবেন যে, আজকে আমতলায় এক বিরাট ছাত্রসভার আয়োজন করেছিলাম। তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা আমাদের আগামী যাবতীয় পরীক্ষাসমূহের তারিখ পেছোবার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবো। যদি কর্তৃপক্ষ তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজী হন ভাল; না হলে আমরা পরীক্ষা বর্জন করতে বদ্ধ পরিকর। আমরা ঘুরে ঘুরে সবার মতামত সংগ্রহ করেছি। আপনি কি পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে, না বিরুদ্ধে?

সোহরাব। বিরুদ্ধে। একশ'বার বিরুদ্ধে। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সত্য-মিথ্যা সব কিছুর বিরুদ্ধে। আমি মন দেয়া-নেয়ার বিরুদ্ধে। তার জন্য নানারকম কলাকৌশল উদ্ভাবন করার বিরুদ্ধে। গুন গুন করে কথা বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলে চিঠি লেখালেখির বিরুদ্ধে। আমাকে আদৌ জানেন না বলে আমার ওপর অযথা দোষারোপ করছেন। আমি প্রেমের বিরুদ্ধে। আমি পরীক্ষার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধ পরীক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষা না নেওয়ার বিরুদ্ধে। আপনাদের আর কিছু বলার আছে?

মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড (পৃ– ১৩২)

আবার অন্যদিকে সোহরাব ভালো ফল প্রত্যাশী, প্রতিযোগিতাপরায়ণ, জেদি এবং জঙ্গিমেজাজের। টিউটোরিয়াল খাতাটা হাতছাড়া হওয়া এবং প্রেমপত্র নিয়ে জটিলতা সোহরাবের ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত পড়েছে ভেবে সোহরাব মনে কষ্ট পায়। তারপরও প্রতিদ্বন্দ্বী মীনার উপর ক্ষুব্ধ হয়েও অন্যান্য সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে বলে–

'তোমরা মিস মিনা মিনহাজকে জানো না, পরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে রাক্ষসী! প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে ওর কুহকের অন্ত নেই। আমার খাতাটা ও চিবিয়ে খাবে, নিজেরগুলো তার সঙ্গে মিশিয়ে চিবোবে। তারপর পরীক্ষার খাতায় সে সব জিনিস এমনভাবে উগলে দেবে যে, সাধ্য কি পরীক্ষকরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে রাখে। সেই শোকে আমি মুহ্যমান।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০)

সোহরাব চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

'কোন কিছু সম্পর্কে তার (সোহরাব) ধৈর্য অত্যন্ত কম। একজন ভালো ছাত্রের এ গুণটুকু না থাকায় তার চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নানা অসঙ্গতি। নাট্যকার নিতান্ত হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়ে তার মধ্যে বালক-সুলভ গুণগুলি আরোপ করেছেন। যেমন, তার ছিনিয়ে নেওয়া খাতাটির জন্য সে মীনার বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরী করেছে, তার একটি খসড়া খাতা জোর করে হাত করেছে, বিভাগীয় সেমিনারে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে। কিন্তু আপাত বিরোধী এসব কর্মকাণ্ডের অন্তরালে সোহরাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল মীনার প্রতি তার দুর্বলতা। মীনার খসড়া খাতার ভিতরে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তন্ন তন্ন করে সে আবিষ্কার করেছে মীনার অন্তর্লোকের প্রতিচ্ছবি। সে বাকপটু। কথার পিঠে কথা সাজাতে তার তুলনা নেই। (রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, থিয়েটার, পৃ. ১৫৪)

এ থেকে বোঝা যায় 'চিঠি', নাটকের সোহরাব মুনীর চৌধুরীর অত্যন্ত যত্নশীল সৃষ্টি। যার ভিতর দিয়ে সমস্ত নাটকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে নাট্যকার। সোহরাব চরিত্রে রয়েছে মনন, রসবোধ ও প্রেমানুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশ।

চার.

'চিঠি' নাটকের নায়িকা মিস মীনা মিনহাজ। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসাইটে' ছাত্রী বলা হয়। সে অত্যন্ত তেজি, জেদি, মেধাবী, আত্মসচেতন, আধুনিকা ও

আকর্ষণীয়া। সাধারণ মেয়ের পক্ষে যা করা সম্ভব না, তা মীনার পক্ষে করা কঠিন কোনো কাজ না। সোহরাবের সঙ্গে তার বিরোধ খাতা ছিনিয়ে নেওয়া ও পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে সোচ্চার ও কঠোর মনোবৃত্তির কারণ। তবে মীনার দুর্বলতা সোহরাবকে ঘিরে পুঞ্জীভূত। ফলে মীনা সোহরাবকে খাতা ফেরত দিলেও চিঠিটা সযত্নে লালন করেছে।

মীনার চরিত্রে দৃঢ়তার পেছনে কাজ করেছে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এবং পুলিশ অফিসার বড় ভাই আসাদুজ্জামানের অভিভাবকত্ব ও স্নেহ। সোহরাবের প্রতি হৃদয়বৃত্তিক দুর্বলতার কারণেই মীনা বড় ভাইয়ের উপর রাগ করে আত্মহত্যা করতে পারে না এবং সোহরাবের ডাকে তার অভিমান ভাঙে ও বদ্ধ দুয়ার খুলে বের হয়ে আসে।

তাইই মীনার স্বভাব নাটকে ফুটে উঠেছে–

> মীনা। আমার রাফখাতাটা! পশু পশু! অনুভূতিহীন বর্বর চোয়াড়ে চাষা! কেবল চুরি করে আশ মেটেনি। দশজনকে ডেকে দেখিয়েছে, নিজে বাহাদুরী নিয়েছে, একটা মেয়ে সম্পর্কে কুৎসিৎ কথা রটিয়েছে। সামনে পেলে ওঁকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। (মুনীর চৌধুরী রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২)

পাঁচ.

'চিঠি' নাটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রক্টর বদরুল হাসান। পেশায় তিনি শিক্ষক, কিন্তু দায়িত্বে আছেন প্রক্টরের। তিনি অধিক মাত্রায় দায়িত্ববান হওয়ার ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রমে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্যক্তিত্বে গভীর ছিলেন না। স্বাভাবিক বিষয়ে তার অস্বাভাবিক আচরণ প্রতিনিয়ত ঘটত ছাত্রছাত্রীদের সাথে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক চলাফেরা মেনে নিতে পারতেন না। তিনি ছিলেন সন্দেহপ্রবণ ও বাতিকগ্রস্ত প্রকৃতির মানুষ। অবশ্য এমন আচরণের জন্য তাকে বেশ যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে এবং তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন–

> 'প্রোক্টরের চাকরি বড় দুঃখের। সরকারী পুলিশ আমাদের জব্দ করতে চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে অষ্টপ্রহর হুকুমের ওপর রেখেছে। ছাত্ররা আমার গাত্রে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছে। আর আমার সহ্য হয় না। আমি এমনিতেও স্থির করেছি পদত্যাগ করব। আমার এই শেষ অবস্থায়, তুমি আত্মহত্যা করে আমাকে আবার জীবননাশ করতে বাধ্য কর না।'
>
> (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫)

একথা থেকে বোঝা যায় প্রক্টর বদরুল হাসান দায়িত্ব পালনে কতটা নাস্তানাবুদ হয়েছেন এবং অসহায়।

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলনে নামলে প্রক্টরের এক হাস্যকর কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। প্রক্টর বদরুল হাসান আন্দোলনের কয়েকশ' লিফলেট সংগ্রহ করে রাখে এবং মনে করে এটি তার দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

হাসান। এই যে পেয়েছি। একেবারে এক ঢং। বুঝলে আসা, এই যে শ'-শ' লিফলেট এখানে দেখছ, এগুলো সব পরীক্ষা পেছাবার মহা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ। বছরের হিসেব ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা পুলিশের লোক এর আসল মূল্য কোনো দিন বুঝবে না। আত্মত্যাগের মহাকীর্তি ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে এই মহান আন্দোলনের ধারা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আন্তরিকতায়, সংঘবদ্ধতায়, উচ্চকণ্ঠিতায় আর সকল জাতীয় আন্দোলন এর কাছে তুচ্ছ। মিউজিয়মের কিউরেটর ডক্টর দানী বলেছেন যে তিনি এগুলো ইমারতের মলাটে বাঁধাই কোরে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রাখবেন।'

(পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯)

এর থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় প্রক্টর হাসানের বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের গভীরতা কতটুকু। এই চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার মুনীর চৌধুরী কৌতুকরসের নির্মাণ করেছেন এবং হাস্যরসের জন্ম দিয়েছেন।

ছয়.

'চিঠি' নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলো খুব বেশি উল্লেখযোগ্য না হলেও চরিত্রগুলোর ভূমিকা নাটকের নানা অঙ্গে গুরুত্ব বহন করে। আন্দোলনবিরোধী পক্ষে কাজ করেছে খালেদ, তারেক ও সোহরাব। আর আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছে রমীজ, আফতাব ও খয়ের। পুলিশ অফিসার আসাদ মীনার বড় ভাই। তার চরিত্রের পালনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাঙ্গাত্মক। আসাদ বুদ্ধিদীপ্ত ও কালসচেতন। বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ সমাজে আসাদ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এ নাটকের পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে নাট্যগবেষক জিয়াউল হাসান বলেছেন–

'নাটকটির প্রায় সবগুলি চরিত্রই কমবেশি হাস্যরসাত্মক। এদের জীবনের স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতিই আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করেছে। তবে স্থান ও সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তম জীবনের গণ্ডি থেকে এ চরিত্রগুলি চিহ্নিত হয়নি বলে এর আবেদন সার্বজনীন হতে পারেনি।'

(রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, থিয়েটার, পৃ–১২৬)

এক কথায় বলা যায় মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' নাটকটি চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চিঠি' নাটকের চরিত্র নির্মাণ সম্পর্কে কবীর চৌধুরী বলেছেন–

'প্রতিটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রতিভাবান ছাত্র রোমান্টিকতা বিরোধী নায়ক সোহরাব, ঈষৎ লাজুক ভাবালুতামণ্ডিত তারেক, ক্রীড়া বিশারদ খালেদ, আদর্শহীন ডিরেক্ট এ্যাকশনে বিশ্বাসী উচ্চকণ্ঠ ছাত্রনেতা রমীজ, ভাষণপটু জঙ্গী ছাত্র আফতাব, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিমতী থেকে তেজোদীপ্তা নায়িকা মীনা, উচ্ছলা অপেক্ষাকৃত লঘুচিত্তা সহপাঠিনী রুমা, কর্তব্যনিষ্ঠ লিফলেট সংগ্রহে অলর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হাসান ঘটনার টানা-পোড়েনে কিছুটা বিমূঢ় মীনার স্নেহশীল

পুলিশ-অফিসার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসাদ–চিঠি নাটকের এইসব চরিত্রই তাদের আচার-আচরণ এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।'

(কবীর চৌধুরী, 'প্রসঙ্গ নাটক', পৃ. ২৪৪)

সাত.

মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' নাটকের বিষয়বস্তু, বিচিত্র চরিত্রায়ণ, ভাষার নান্দনিক গাঁথুনি ও শিল্পদক্ষতা যুগোপযোগী ও যুগোত্তীর্ণ। ফলে নাটকটির ভাষা ও সংলাপ মার্জিত, সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে কোনো কোনো সমালোচক দীর্ঘ সংলাপের সমালোচনা করেছেন। তবে মুনীর চৌধুরী নাটকের ভাষা ও গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে বলেছেন–

'ভাষার ব্যবহারে, সাহিত্যিক প্রতিধ্বনিতে, অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তির নিপুণ প্রয়োগে, ছন্দোবদ্ধ শ্লোগানে জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় চিঠি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪)

তাই তো নাট্যকার আন্দোলনকারী ছাত্র রমীজের সংলাপে বলেছেন–

'উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে এই রকমই হয়। আন্দোলন কোন্দলনে পরিণত হয়, দলাদলি দলাই-মলাইতে গিয়ে ঠেকে। এটা ছাত্র আন্দোলনের জন্য গৌরবজনক নয়।' (মুনীর চৌধুরী রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭)

কিংবা

'চিঠি' এসে গেছে সংগ্রামের। আপোসহীন সংগ্রামের। সর্বশেষ সংগ্রামের। চিঠি এসেছে প্রতি সংগ্রামী ছাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে। চিঠি এসেছে আগামী দিনের ছাত্রশক্তির বিজয়বার্তা বহন করে।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১)

সোহরাবের সংলাপ থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়–

'অন্ধকার দুর্গের মধ্যে নিজকে আটক করে রেখেছিলাম। আত্মস্তুতির কারুকাজ করা বর্ম পরে সেই অন্ধকারে মহানন্দে ডুবতে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনে তোমার খাতার পাতা খুলে গেল। কী আনন্দ, দুর্গের পর পরিখাপ্রাকার শূন্যে মিলিয়ে গেল। যেই শুনলাম তুমি বিপন্ন, কঠিন বর্ম গলে অঙ্গে মিলে গেল। রুদ্ধ দুয়ার খুলে মুক্ত আমি বেরিয়ে এসে পাগলের মতো চীৎকার করে তোমাকে ডাকছি। মীনা। মীনা। সাড়া দাও। বেরিয়ে এস। রুদ্ধ দুয়ার খুলে বেরিয়ে এস। মুক্ত, জীয়ন্ত সোনার তুমি, বেরিয়ে এস। শক্তি দাও, অপমান কর, উপহার দাও, প্রহার কর–তবু বেরিয়ে এস। যদি স্বেচ্ছায় না আস, আমি সবলে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব! এই রুদ্ধ দুয়ার আমি ভেঙে ফেলব। ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখি তোমার অঙ্গ প্রাণহীন, তাকেই গ্রহণ করব। একই সাথে নিজের দেহ তোমার পাশে স্থাপন করব। কিন্তু তবু তোমার কাছে আসব। আসবই আসব। আসব।

(পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯)

চিঠি নাটকে সংলাপের দীর্ঘতা থাকলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রগুলোর ভিতরে আবেগের মাত্রা একটু বেশিই নাট্যকার দেখিয়েছেন। বিদ্রূপও

নাটকটিতে বৈচিত্র্য এনেছে। তারই প্রকাশ প্রক্টরের সংলাপ এসেছে ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে–

> 'তুমি জানো না এই উনিশ-কুড়ি বছরের পড়ুয়া ছেলেমেয়েগুলো কী সাংঘাতিক জিনিস। সব ঘূর্ণমান আগুনের ভেলা। যাবতীয় উদ্ভট চিন্তার ডিপো। কোনো দু'জনের আচরণ এক রকম নয়। কোনো একজনের দুটো আচরণ এক রকম নয়। সাধ্য কি আগে থেকে তুমি কোনো কাণ্ড আঁচ করো। যে ছেলে বাড়িতে কাঁটা বেছে মাছ খেতে জানে না, রাস্তায় নেমে সে ছেলেই বেয়োনেটের সামনে বুক পেতে দেয়। ক্লাসে মাস্টারের সামনে বসে থাকে ভীরু শশকের মতো বাইরে সহপাঠিনীর সামনে নিজের বীর্যবান পৌরুষ জাহির করতে গিয়ে কী যে বলে আর না বলে তার কোনো মা-বাপ নেই।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮–১৩৯)

সোহরাব, রমীজ ও তারেকের একত্রিত কথোপকথনের মার্জিত শব্দ ব্যবহার ও ভাষার চমৎকার কারুকার্য নাট্যকার দেখিয়েছেন–

> সোহরাব। তোমার চিঠির জবাব পাঠিয়েছে। লিখেছে : সকল ক্রীড়ার শিরোমণি আপনার নিপুণ পত্রাঘাতের মর্মপীড়ায় নির্যাতিত হয়ে এখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছি। তারেক-সোহরাব নিপাত যাক্! আপনি ছাড়া অন্য পুরুষকে মনুষ্যজ্ঞান করি না। ঘরের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর, এই দুই দানব বধ করে বন্দিনী রাজকন্যার প্রাণোদ্ধার করুন।
>
> তারেক। সোহরাব যাবে। যেমন করে কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর কাছে যায়। সকল দর্পদম্ভ সমূলে বিসর্জন দিয়ে। বিনম্র বিশুদ্ধ চিত্তে। করুণায় ভালবাসায় বিগলিত হয়ে। (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০)

অন্যদিকে আবার নাট্যকারের ক্রোদ্ধান্বিত সংলাপ নায়ক-নায়িকার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে–

> সোহরাব : ওঁর মতো মহিলার সঙ্গে সংযত ব্যবহার করার কোনো সংগত কারণ আমি স্বীকার করি না। উনি কোমল নন, নম্র নন, লাজুক নন। উনি রীতিমতো মার-মুখো, দফঙ্গাকাঙ্ক্ষী, ঘাতকী! (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫)
>
> মীনা : কৃষক! কৃষক! শেখেনি, এখনও শেখেনি মেয়েদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়। ভাষার ওপর লাগাম নেই। শরীরের ঝোঁক সামলাতে জানে না। মনে হয় যে সত্যি সত্যি গায়ে হাত ওঠাবে। পশু! পশু! (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫)

ভাষা ও সংলাপের বর্ণনায় নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর যে প্রয়োগ তা যথার্থই। তবে নাটকীয়তা, বিশেষণ, উপমা, অলঙ্করণ নাটকে কম ব্যবহার করেননি নাট্যকার। এর ব্যবহার সংলাপের অংশ বিশেষে দেখানো যাচ্ছে–

> 'আপনারা কাদের প্রতিনিধি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হ'ল মৃদুকণ্ঠী সুবেশী অবলা মহিলারা। আপনারা একবারও তাঁদের মতামত যাচাই করেছেন? সেই মতের গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বর্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন। তাঁরা জাত হিসেবে সংখ্যালঘু হতে পারেন, তাঁরাই হলেন এই শ্রীহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রকৃত শোভা, আমাদের প্রাণহীন জীবনের একমাত্র চাঞ্চল্য, আমাদের অসাড় চিন্তাজগতের দুর্লভ জীয়নকাঠি।' (পূর্বোক্ত, পৃ.-১৭৮)

অর্থাৎ মুনীর চৌধুরী 'চিঠি' নাটকের পূর্ণতার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনীয় ভাষা ও সংলাপের যথার্থ ব্যবহার দেখিয়েছেন। নাট্যকার মুনীর চৌধুরী চেতনা ও প্রাণে স্বপ্রণোদিত এক মহৎপ্রাণ। তারই প্রতিফলিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে ভাষা ও সংলাপে।

আট.

'চিঠি' নাটকের নামকরণ যথার্থ হয়েছে। কারণ নামকরণের মাধ্যমে নাটকের রূপায়ণ ও চরিত্রায়ণ পরিপূর্ণরূপে সার্থক রূপ পেয়েছে। সবকিছুর ক্ষেত্রে নামকরণ একটা গুরুত্ব বহন করে। তাৎপর্য মণ্ডিত ভাবনার সফল প্রয়াস এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। 'চিঠি' নামকরণের পেছনে ভূমিকা রেখেছে প্রেম নিবেদনের একটি বিষয় ও চিঠি। আর এই চিঠিকে কেন্দ্র করে নাটকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ভুল বোঝাবুঝিসহ নানাবিধ ঘটনা ও হৃদয়বৃত্তির মিলনের সূচনা হয়েছে। ফলে নাটকের শেষ পর্যন্ত একটা চূড়ান্ত উত্তেজনা ও আবেগের সঠিক নির্মাণ আমরা পরিলক্ষিত হতে দেখেছি। অঙ্কুরিত মনের যে আবেগ ও বেদনা তারও প্রকাশ এই চিঠিকে ঘিরে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়া নায়ক-নায়িকার মনের অদমিত যে ইচ্ছা তার প্রকাশও নাট্যকার নাটকে নির্মাণ করেছেন। নাটকে আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সংলাপ নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, তার পেছনের কারণ দেখলে দেখা যায় দ্বন্দ্বটা মূলত সোহরাব ও মীনার মানসিক টানাপোড়েন। যার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু ঐ 'চিঠি'।

অভিন্ন ইচ্ছা ও চেতনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলা চরিত্রগুলোর গাঠনিক ভূমিকা নাটকের প্রাণ। এই প্রাণগুলোর প্রাণস্পন্দনই 'চিঠি'র যথার্থ উৎকর্ষতা। সেই উৎকর্ষসাধনের অভীষ্ট লক্ষ্যে নাট্যকারের নামকরণ নাটকটিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

'চিঠি' নাটক সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> 'বিভিন্ন বিদ্যায়তনে ছাত্র-আন্দোলনের আলোড়িত রুষ্ট পরিবেশের পশ্চাতে তারুণ্যের অযৌক্তিক উদ্দীপনার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের খবরদারী ও দৃষ্টিহীনতার যে সংঘাত বিদ্যমান 'চিঠি' নাটক তার এক কৌতুকাবহ রূপায়ণ।
>
> (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত", পৃ. ৪৫২)

অর্থাৎ আমরা এর থেকে বুঝতে পারি কৌতুকাবহ রূপায়ণই নাটকটির পরিচয়। এই পরিচয়ের মাধ্যম হচ্ছে নামকরণ। যা নাটকটির মর্যাদা ও গুরুত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই সমৃদ্ধির পথে নাট্যকারের সঠিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নয়.

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতরে দিয়েই সুন্দরের পথে প্রসারিত হওয়া যায়। যেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই, সেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে সৌন্দর্য নেই। মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' নাটকের প্রাণই হচ্ছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মুনীর চৌধুরী নাটকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণের ক্ষেত্রে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচায়ক। এ দ্বন্দ্বে স্থান পেয়েছে পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষের ছাত্ররা। পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের পক্ষের ছাত্ররা হলো রমীজ, আফতাব ও খয়ের; বিপক্ষের দলের সোহরাব, তারেক ও খালেদ। এই দুই পক্ষের আন্দোলনই নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে খাতা ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে নায়িকা মিস মীনা মিনহাজ ও নায়ক সোহরাবের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সোহরাব ও মীনার দ্বন্দ্বমুখর সংলাপ নির্মাণ করেছেন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী–

সোহরাব। আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে আপনার আধুনিকতাটা একটা ভঙ্গী মাত্র। আসলে তার গভীরতা আপনার প্রসাধনের প্রলেপের চেয়ে বেশী নয়।

মীনা। আপনি যে মুক্তবুদ্ধির বড়াই করেন সেটাও একটা ভণ্ডামি। আদর্শের যে বুলি প্রচার করেন তা আগাগোড়া মেকি। রুচি, শিক্ষা, ভদ্রতার যে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান, সেটা খুলে ফেললে ভেতর থেকে যা বেরিয়ে পড়বে তা ইতর, গ্রাম্য, নোংরা!

সোহরাব। এসব কথা আপনি বলছেন, আমাকে! আপনাকে আমি চিনি না? স্বাধীনা রমণীর ঢং কেবল বাইরে, ভেতরে সেই মধ্যযুগীয় অন্ধতা, মধ্যযুগীয় ভীরুতা, মধ্যযুগীয় সন্দিগ্ধতা!

মীনা। কেবল বাক্য, বাক্য, বাক্য ! অন্যকে দিয়ে নিজের গরজ মেটাতে লজ্জা করেনি আপনার? খাতা পাবার বেলায় নিজের বীরত্ব উবে গেল কেন?

সোহরাব। আমি আপনাকে খাতা পাঠিয়েছি?

মীনা। এক শ'বার পাঠিয়েছেন। আপনি ছাড়া তার মধ্যে অকথা-কুকথায় ভরা পত্র ঢুকিয়ে রাখবে কে? পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর আবার নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য পুলিশের কাছে ছুটে গেলেন কোন্ লজ্জায়? আপনি আসলেই বঞ্চক, নীচ, খল!

(মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.– ১৬৪)

ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মুনীর চৌধুরীর নাট্যনির্মাণশৈলী সম্পর্কে বলেন–

'সমসাময়িককালের বিক্ষোভ ও সংগ্রাম, আন্দোলন ও সংঘাতের যন্ত্রণাময়, ব্যঙ্গাত্মক, হাস্যরসাত্মক ও চিত্ত-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এক অভিজাত চিত্র তাঁর নাটকে প্রতিফলিত। মানবহৃদয়ের চিরন্তন কামনা-কামনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ত্যাগ-ভোগ, স্বার্থান্ধতা ও গভীর মননশীলতায় মুনীর রচনা সমৃদ্ধ। চিত্ত-প্রবৃত্তির উত্থান-পতন ফুটাতে গিয়ে তিনি বাংলা নাটকে সর্বোত্তম অধুনা চেতনা ও প্রাগ্রসর

কল্পনার প্রশ্রয় দিয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যের বিদগ্ধ অনুরাগী লেখক তাঁর নাটকের আঙ্গিক প্রসাধনে বিদেশী নাটকের গঠন চাতুর্যের প্রতি সচেতন আগ্রহী। তাঁর নাটক মনোপযোগী পরিবেশ পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন রুচি ও নিটোল শৈল্পিক দৃষ্টি তাতে সজাগ। মুনীর চৌধুরীর ভাষারীতি সরল এবং বলিষ্ঠ, কথনভঙ্গি শানিত!

(মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পৃ. ৪৮৭-৪৮৮)

এ থেকে বোঝা যায় নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর সার্বিক সৃজনীশক্তির পরিচয় ও দক্ষতা। তাঁর গভীর বোধই শিল্প সফল প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সমস্ত গুণই তাঁর ভিতরে বিদ্যমান। আত্মিক জাগরণে তিনি বলীয়ান। এজন্য তাঁর 'চিঠি' নাটকটি কালজয়ী ও সফল নাট্যপ্রয়াস লাভে সক্ষম হয়েছে।

দশ.

শেষ কথায় বলা যায়, 'চিঠি' নাটকের শুরুতে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, শেষে পরিলক্ষিত হয় নায়ক-নায়িকার মিলনাত্মক আবহ। এছাড়া সমস্ত নাটক জুড়ে রয়েছে অধিক হাস্যরসের রসদ। নাটকটির সমস্ত পরিবেশ চরিত্রনির্ভর নয়, ঘটনানির্ভর। নাট্যকার নাটকটি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন কাহিনি-বিষয়কে। মুনীর চৌধুরীর দুটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক, তন্মধ্যে 'চিঠি' অন্যতম একটি। মুনীর চৌধুরী ষাটের দশকের নাট্যকার, তাই তিনি নাটকে সমকালীন জীবন সমস্যা, আনন্দ-বেদনা, মিথ ও ইতিহাসকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে শৈল্পিক সিদ্ধতায় নির্মাণ করেছেন। 'চিঠি' নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার লক্ষ রেখেছেন বিষয়বস্তুর প্রসারিত পথের সীমারেখা, মূল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার সফল চেষ্টা করেছেন অপ্রধান চরিত্রগুলোর রূপায়ণে, চরিত্র নির্মাণের বৈচিত্র্যতা দেখিয়েছেন নাট্যকার। এছাড়া ভাষা ও সৃজনশীলতার পারস্পরিক মেলবন্ধনও এ নাটকে প্রশংসার দাবি রাখে। সবকিছু মিলে বলা যায়, মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' শিল্পসফল ও কালজয়ী নাটক।

শামস্ আল্‌দীন

বাংলা বিভাগ

উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

তথ্যসূত্র

১। রামেন্দু মজুমদার 'সম্পাদিত, 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক', মার্চ, ঢাকা, ১৯৯৯।
২। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, 'থিয়েটার নাট্য ত্রৈমাসিক', দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৬।
৩। কবীর চৌধুরী, 'প্রসঙ্গ নাটক', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮১।
৪। মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, রাজশাহী, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।
৫। আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।
৬। সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭–১৯৭১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ–১৯৯৮।
৭। মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৮। মো. ফরহাদ হোসেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর অবদান, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮।

চ রি ত্র

পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান, মীনার ভাই
অধ্যাপক বদরুল হাসান
ছাত্র : সোহরাব
খালেদ
তারেক
রমীজুদ্দিন
আফতাব
খয়ের
ছাত্রী : মিস মীনা মিনহাজ
মিস রমা জোয়ারদার
এবং আরো কয়েকজন ছাত্রছাত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ছাত্রাবাসের একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষ। তিন বান্দা হাজির। সোহরাব অতি উত্তেজিতভাবে পদচারণ করছে এবং ঘনঘন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারেককে লক্ষ্য করছে। তারেক পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে চৌকির কোণে বসে আছে। মাঝেমাঝে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে ইতিউতি তাকাচ্ছে। খালেদ চৌকির ওপর ক্রীড়ানির্দেশক কেতাব মেলে রেখে অমানুষিক নিষ্ঠার সঙ্গে ফাঁকা বাতাসে ব্যাট সঞ্চালন করে কাল্পনিক বল দিয়ে বল খেলা অভ্যাস করছে। কসরৎগুলো ঠিক হচ্ছে কি না, মাঝে মাঝে খেলা থামিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটা পরীক্ষা করে এবং মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সোহরাব, তারেক কি বলাবলি করছে, তা সে শুনছে কি শুনছে না, বোঝা যায় না।

যখন পর্দা উঠছে তখন নেপথ্যে বেশ দূরে দূরে অবস্থিত দুটো ঘণ্টা ঢন্‌ঢন্‌ করে বাজছে। প্রথমে ধ্বনি দূরাগত। ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে। মনে হবে যেন বাদক দু'জন চক্রাকারে ছুটতে ছুটতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার ঘণ্টার দ্বৈত ধ্বনি প্রচণ্ড সংঘর্ষে ফেটে পড়ে। বাদক দু'জন ছুটতে ছুটতে আবার পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। ঘণ্টা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়।

রংগমঞ্চে ছিটকে পড়ে এক চিল্‌তা আলো। সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে সোহরাব, তারেক, খালেদ।)

সোহরাব। তোমার এই হতভম্ব ভাব, এই সরলতা মাখা হকচকানো চাহনি, এই যুক্তিহীন রুদ্ধকণ্ঠ আমার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে না।

খালেদ। ওকে এবার ছেড়ে দাও সোহরাব। আরম্ভ করেছো সেই বিকেল থেকে। এখন শেষ রাত। সেহেরীর প্রথম ঘণ্টা পিটিয়ে দিয়েছে। এবার ওকে রেহাই দাও।

তারেক। আমি ইচ্ছে করে দিইনি। নিয়ে নিলো।

সোহরাব। তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাহু বলহীন। চরণ টলোমলো। তাই তোমার কাছ থেকে মিস মীনা মিনহাজ অবলীলাক্রমে খাতাটা কেড়ে নিয়ে গেলো। অবুঝ তুমি, কিছুই করতে পারলে না। এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

খালেদ। এ বেচারার ওপর কামান দাগা বৃথা। মিস মীনা মিনহাজকে তুমিও ভালো মতোন চেনো। জঙ্গী মেজাজের মেয়ে। তারেক তো তারেক দরকার মনে করলে ও-মেয়ে তোমাকে সুদ্ধো চিবিয়ে খেতে পারে।

সোহরাব। মেয়েদের খাদ্য হিসেবে নিজেকে সুস্বাদু করে তোলার সাধনা আমি করি না। সে রাজ্যের বাদশা তুমি। আল্লাহ তোমাকে চেহারা সুরৎ-ও খুব দিয়েছে। তার ওপর সেটাকে মেজে-ঘষে সবসময় এমন তরতাজা রাখো যে, সাধ্য কি রমণী-হৃদয় নির্লিপ্ত থাকে। খেলার মাঠে কারদানি দেখিয়ে অন্যের চোখে যতোই ধুলো দাও না কেনো, তোমার আসল নিশানা কি, সে আমি ভালো করে জানি।

খালেদ। কি জানো?

সোহরাব। তুমি কপট। তুমি নিপুণ। তুমি খোলা সড়কের পথচারী নও, তুমি সুড়ং পথের যাত্রী। কেবল আছো আনন্দ পানের ফিকিরে। নিজের জন্য উল্লাসময় মুহূর্ত নির্মাণের ব্যস্ততায় বিসর্জন দিয়েছো সর্বপ্রকার দায়িত্বশীলতাকে। তোমাকে চিনতে আর বাকী নেই।

খালেদ। তুমি সবাইকে চেনো। কেবল নিজেকেই এখনো চিনে উঠতে পারলে না।

সোহরাব। বুজরুকি রাখো! মেয়েলী চিঠির হেঁয়ালীপনা আমার ওপর আরোপ করতে চেষ্টা করো না। অন্যের জীবনে যেমন রহস্যের অস্তিত্ব স্বীকার করি না, তেমনি নিজের জীবনেও আমি কোনো আলো-আঁধারী ভাব জমে উঠতে দিইনি। আমি প্রেমিক নই। আম হিংসুক। উদারতার ধার ধারি না। আমি লোভী এবং কঠিন। আমি অবিশ্বাসী এবং বিদ্বেষী। যা গ্রাস করতে না পারবো, তা আমি ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলে দেবো।

খালেদ। দাও না কেনো, নিষেধ করছে কে?

সোহরাব। তার আগে তারেককে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই। আমার টিউটোরিয়াল খাতা আমি তোমাকে এক নজর দেখতে দিয়েছিলাম, মিস মীনা মিনহাজের কাছে সে খাতা কি করে গেলো?

তারেক। আমি দিইনি। উনি নিয়ে নিয়েছেন।

সোহরাব। সেই সন্ধ্যেরাত থেকে এই একই বুলি তোমার মুখে শুনছি : 'আমি দিইনি, উনি নিয়ে নিয়েছেন।' আমার জিনিস নেবেন কেনো? তুমি নিতে দেবে কেনো? তুমি ভালো করে জানো যে আমার নাম সোহরাব, আমি খালেদ নই। ক্রীড়াশীলতা আমার স্বভাব নয়। আমি জঙ্গী মেজাজের ছেলে। রমণীর চিত্র ঘরে শোভা বর্ধন করে, এ আমি বিশ্বাস করি না। সে ছবি হৃদয়ে স্থাপন করলে চিত্ত মহানন্দে নৃত্য করতে থাকে, সে মুখ বক্ষে ধারণ করতে পারলে মর্তলোকেই জীবন অনন্ত সুখময় বলে অনুভূত হয়–এই সব আত্মবঞ্চনাকর প্রলাপ-বাণীতে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তুমি কি ভেবেছো মিস মীনা মিনহাজের পদ্মপলাশ নেত্র আমার হস্তাক্ষরের নাগপাশে বাঁধা পড়ে থাকবে, এই আশায় আমি আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে যাবো? আমার খাতা তুমি হাতছাড়া করলে কেনো?

তারেক। তোমার খাতাটা সামনে মেলে রেখে সেমিনারে চুপচাপ বসে ছিলাম। অন্য টেবিলটার এক কোণে মাথা নিচু করে মিস মীনা মিনহাজ পড়ছিলেন। এক পাশ থেকে তাঁর ঘাড়ের সবটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

খালেদ। চোখ তো বললে মেলে রেখেছিলে সামনে খুলে রাখা সোহরাবের খাতার ওপর। একপাশ থেকে অন্য কোন্‌খানে তখন কি দেখা যাচ্ছিলো বা যাচ্ছিলো না, তা ঠাহর করলে কি করে?

তারেক। আমি সোহরাবের নোট পড়ছিলাম না।

সোহরাব। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছো। নিজের সম্পর্কে এতো পরিপূর্ণ ধারণা রাখে এমন আদমী শতেকে একজন মেলে। যখন তুমি আমার খাতাটা চেয়ে নিলে, আমি তখনই তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। আমার হস্তাক্ষর ছাড়া অন্য কিছুর মর্মোদ্ধার করতে তুমি সমর্থ হবে, এমন দুশ্চিন্তা কস্মিনকালেও আমার মনে উদিত হয়নি। কিন্তু পড়ে যদি নাই বুঝবে তবে খাতাটা চেয়ে নিলে কেনো?

তারেক। ভেবেছিলাম চেষ্টা করে দেখবো। ভেবেছিলাম তোমার লেখা যদি তোমার কথার মতো না হয় তবে হয়তো বুঝেও ফেলতে পারি।

সোহরাব। সে চেষ্টা করলে না কেনো? সামনে খাতা খুলে রেখে অন্য পাশ দিয়ে আরেকজনের সবটা কাঁধ দেখতে গেলে কেনো?

তারেক। মিস মীনা মিনহাজ মাথা নিচু করে পড়ছিলেন। এক পাশ থেকে ঘাড়ের সবটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। গলায় ভাঁজ পড়েছে–শঙ্খের মতো রেখা রেখা। সোনার সরু শিক্‌লিটা

চিকচিক করছে। কিছু নরম গুঁড়ো চুল ফ্যানের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছিলো।

খালেদ। খামোখা জেরা করছো। দেখতে পাচ্ছো না হুঁশ ফেরেনি। এখনও সেই সেমিনারের ঘোরের মধ্যে আটক হয়ে আছে।

সোহরাব। কিন্তু কেনো? আমিও সে রহস্যই ভেদ করতে চাই। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ নয় যে, আমার খাতা খোয়া গেছে বলে ও শোকে অসাড় হয়ে পড়বে। চৈতন্য হারাতে হলে আমাকে হারাতে হয়। কারণ আমার সন্তানকেই ডাইনী এসে তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা মিস মীনা মিনহাজকে জানো না, পরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে রাক্ষসী! প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে ওর কুহকের অন্ত নেই। আমার খাতাটা ও চিবিয়ে খাবে, নিজেরগুলো তার সঙ্গে মিশিয়ে চিবোবে। তারপর পরীক্ষার খাতায় সে সব জিনিস এমনভাবে উগলে দেবে যে, সাধ্য কি পরীক্ষকরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে রাখে। সেই শোকে আমি মুহ্যমান। কিন্তু এত বড়ো কাণ্ড হৃদয়ঙ্গম করবার মতো কল্পনাশক্তি ওর নেই। তবু এই নবকুমার এতো কাতরাচ্ছে কেনো, সেইটাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

খালেদ। পারা উচিত। তোমার কথার তোড়ে আক্কেল গুড়ুম হবে না, এমন দৃঢ়চিত্ত তালেব-এলেম এখনও এই মহাবিদ্যালয়ে দাখেল হয়নি।

সোহরাব। আমার খাতা সামনে মেলে ধরে তুমি কি পড়ছিলে?

তারেক। একটা চিঠি।

সোহরাব। চিঠি? আমার খাতার মধ্যে?

তারেক। মিস মীনা মিনহাজকে উদ্দেশ্য করে লেখা। লেখা আমার নয়, কিন্তু প্রতি ছত্রের ভাব যেনো আমারই অন্তরের উত্তাপ মাখানো।

সোহরাব। এই চিঠির ভাব-ভাষা কি ছিলো, তার রচয়িতা কে সে-সব কথা জানবার জন্য আমার মনের মধ্যে অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই তা তোমাকে নিবৃত্ত করতে হবে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কথার জবাব দিয়ে নাও। জবাবের জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করবো। প্রার্থনা করি তোমার সরলতা যেনো মহা ভয়ানক কপটতা বলে প্রমাণিত না হয়, তোমার মন্থর বুদ্ধি যেনো বীভৎস ষড়যন্ত্রের উৎসস্থল হয়ে না দাঁড়ায়।

তারেক। তোমার সন্দেহ অমূলক। তুমি যা আশংকা করছো তাই হয়েছে।

সোহরাব। অসম্ভব। মিস মীনা মিনহাজ তোমার কাছ থেকে আমার খাতাটা যখন ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তুমি বলতে চাও, ঐ কথিত প্রেমপত্রটি তখনও তার মধ্যে ছিলো?

তারেক। খাতা থেকে পত্র বিযুক্ত করার সময় পেলাম কোথায়? ওনাকে আচমকা এগিয়ে আসতে দেখে খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। উনি বন্ধ খাতাটাই তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

(একটা কাল্পনিক বলের আঘাতে খালেদ আউট হয়ে যায়। ব্যাট উঁচুতে তুলে হতাশা জ্ঞাপন করে। মাটিতে বসে পড়ে তারেকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সোহরাব ক্ষণকালের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। দরজায় কারা যেন টোকা দেয়। সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়ে। রমীজুদ্দিন, আফতাব, খয়ের প্রমুখ ডাইনিং হলে সেহরী খেতে যাবার পথে সোহরাবদের ঘরে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে। পোশাক-পরিচ্ছদ সেই অনুযায়ী।)

রমীজ। আপনারা সেহরী খেতে যাবেন না? ধর্মকর্মের সঙ্গে যে বেশী যোগাযোগ রাখেন না তা সকলেই জানে। কিন্তু সেহরীতে শরীক হতে অবহেলা, এমন সচরাচর ঘটে না। বিশেষ করে যেদিন মেনু মুরগী আর দই। ব্যাপার কি, সব এ-রকম চুপ মেরে বসে রয়েছেন কেনো?

আফতাব। হয়তো আমরা হঠৎ এসে পড়ে ওদের কোনো গোপন মন্ত্রণাসভায় বাধা দিলাম।

খয়ের। সবাইকে যেনো কি রকম গমগিন দেখা যাচ্ছে।

রমীজ। কিছুই বিচিত্র নয়। এনারা সবাই হলেন আধুনিক দুনিয়ার বাসিন্দা। চলনে-বলনে সর্বপ্রকার ঐতিহ্যের বিরোধী। স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব হতে দেখলে এঁদের মুখে অন্ন রোচে না। অবাধ মেলামেশার এঁরা জবরদস্ত প্রচারক। অন্যায় বলেছি কিছু?

খালেদ। বিলকুল না।

রমীজ। তবে সম্প্রতি হয়তো তিনজনেই কোনো বিশেষ বিমারীতে আক্রান্ত হয়েছেন। খুব পেরেশান মালুম হচ্ছে। খোদা নাখাস্তা, একই প্রেমের পীড়নে তিনজনেই জমা'তে জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করেছেন না তো!

সোহরাব। প্রেমের চতুর্দশ বংশ নিপাত যাক্।

রমীজ। তা যাক্। সে বিমারী না হইলেই ভালো। বিশেষ করে এ-রকম এজমালিভাবে। হলে এলাজ করানো মুশকিল হতো।

সোহরাব। আমাদের উন্নতি কামনা করা ছাড়া আপনার মনে বোধহয় আরো কিছু গুরুতর উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে দল বেঁধে আসতেন না। বাইরেও মনে হচ্ছে অনেকে অপেক্ষা করছেন।

রমীজ। করছেন। তাহলে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক্।

সোহরাব। কথা হলেই আমার চলে। কাজের না অকাজের সে বিষয় বরাবর অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখি।

রমীজ। ওহ্! বেশ। আপনি বোধহয় খবর পেয়ে থাকবেন যে, আজকে আমতলায় এক বিরাট ছাত্রসভার আয়োজন করেছিলাম। তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা আমাদের আগামী যাবতীয় পরীক্ষাসমূহের তারিখ পেছোবার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবো। যদি কর্তৃপক্ষ তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজী হন ভাল; না হলে আমরা পরীক্ষা বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। আমরা ঘুরে ঘুরে সবার মতামত সংগ্রহ করেছি। আপনি কি পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে, না বিরুদ্ধে?

সোহরাব। বিরুদ্ধে। একশ'বার বিরুদ্ধে। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সত্য-মিথ্যা সব কিছুর বিরুদ্ধে। আমি মন দেয়া-নেয়ার বিরুদ্ধে! তার জন্য নানারকম কলাকৌশল উদ্ভাবন করার বিরুদ্ধে। গুন গুন করে কথা বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলে চিঠি লেখালেখির বিরুদ্ধে। আমাকে আদৌ জানেন না বলে আমার ওপর অযথা দোষারোপ করছেন। আমি প্রেমের বিরুদ্ধে। মিলনের বিরুদ্ধে। বিরহের বিরুদ্ধে। আমি পরীক্ষার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষা দেয়ার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষা না দেয়ার বিরুদ্ধে। আপনাদের আর কিছু বলার আছে?

রমীজ। আছে। কিন্তু তার আগে আপনার কথাগুলো একবার ভালো করে ভেবে দেখি। আপনিও আমাদের কথাগুলো আরেক বার মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখবেন। আমরা ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা ঘর ঘুরে আসি। ফেরার পথে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়ে যাবো।

খয়ের। ছা আ ত্র ঐক্ ক্য অ!

(ভেতরের তিনজন এবং বাইরের অনেকে সমস্বরে নারা লাগায় : জিন্দাবাদ! পরপর তিনবার, ক্রমোচ্চ কণ্ঠে। তারপর তিনজনই কাতার দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতা।)

সোহরাব। পত্রে কি লেখা ছিলো!

তারেক। স্বগত উক্তির মতো। এলোমেলো জিজ্ঞাসা। আত্মধিক্কার। না বলা কথার কোলাহল। অপ্রকাশের বোঝা সহ্য করতে না পেরে কেন কেউ কাণ্ডজ্ঞান হারায়, দিশাহারা হয়, শত্রুতা করতে থাকে–ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

সোহরাব। এ সব কথা তুমি লিখেছো! তোমার চিন্তার জটিলতার এই নবতম পরিণতি লক্ষ্য করে আতঙ্কে আমার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে

যাচ্ছে। মিস মীনা মিনহাজ হয়তো এখন, এই মুহূর্তে, বদ্ধ নিঃশ্বাসে এই পত্র পাঠ করেছেন। প্রতি শব্দের কন্দরে আমার কান্নাভরা কাতর মুখ কল্পনা করে অনুকম্পায় বিগলিত হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো আমার স্বভাবের মধ্যে অকস্মাৎ এক গ্রাম্য গোপনীয়তা, এক অমার্জিত ঔদ্ধত্য আবিষ্কার করে রক্তরঞ্জিত মুখে রাগে গরগর করছেন। কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হওয়া মাত্র অসম্বৃত উল্লাসে আমার দিকে ধেয়ে আসতে পারেন, প্রেমের বন্যায় আমাকে প্লাবিত করে দিতে পারেন, হয়তো তেড়ে আসবেন আমাকে প্রহার করবার জন্য, নাকচ করে দেবেন চিরকালের জন্য একটি মাত্র ভ্রূকুটির বিচ্ছুরিত ঘৃণায়! কে জানে তিনি কি করবেন। তোমরা এখন আমাকে বলে দাও আমার কি করা উচিত।

খালেদ। কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি তো আর চিঠি লেখোনি! তুমি খামোখা এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন?

সোহরাব। আমার খাতার পাতায় লেখা চিঠি আমি অস্বীকার করবো কি করে! বাগে পেয়েও মিস মীনা মিনহাজ আমাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছো!

তারেক। তোমার খাতার মধ্যে ছিলো বটে। কিন্তু চিঠিটা একটা আলাদা কাগজে লেখা হয়েছিলো।

সোহরাব। নিজে যদি লিখতেই পারলে, নিজের খাতার মধ্যে গুঁজে রাখলে না কেন? সরাসরি মিস মীনা মিনহাজের করপদ্মে গুঁজে দিলে না কেনো?

তারেক। চিঠির মুসাবিদা আমার নয়।

সোহরাব। দয়া করে বলবে বি, কোন্ অংশটা তোমার? হৃদয়টা মিস মীনা মিনহাজকে দিয়ে দিয়েছো, বুদ্ধি বাঁধা রেখেছো প্যাপুস্তকের মধ্যে, স্বাস্থ্য ডাক্তারের জিম্মায়! চিঠির মুসাবিদা কাকে দিয়ে করালে?

তারেক। খালেদ লিখে দিয়েছে।

সোহরাব। ওহ্। তুমি! তাই বলো। আমি আরও ভেবে ভেবে হয়রান এই প্রেম-চট্‌কানো নাটুকে চিঠি লেখার মতো পরিপক্বতা তারেক কি করে অর্জন করলো। এ তাহলে তোমার কারসাজি।

খালেদ। দেখ বাপু, তোমার কথাবার্তা শুনে আতংকিত হবো না এমন বীর পুরুষ আমি নই। তবে বিশ্বাস করো আমি কোনো রকম দুরভিসন্ধি নিয়ে ওকে পত্র লিখে দেইনি।

সোহরাব। মিস মীনা মিনহাজ সম্পর্কে তোমার মনেও লালসার ভাব জেগেছে, আগে টের পাইনি।

খালেদ। কী যা তা বকছো। পুকুর পাড়ে বসে বসে তারেক নানারকম মেয়ে সম্পর্কে ওর চিন্তাধারা আমাকে শোনাচ্ছিলো। ওকে সাহায্য করবার জন্য একসময় প্রস্তাব করলাম যে যদি ও চায় তাহলে ওর মনের কথা আমি বাংলায় পত্রাকারে গুছিয়ে লিখে দিতে পারি। এসব কথা ইংরেজীতে পেশ করার রেওয়াজ থাকলে সে-কাজ ও নিজেই আমার চেয়ে শতগুণ ভালোভাবে করতে পারতো।

সোহরাব। তুমি সাধু! পরোপকারী! কিন্তু অন্যের হয়ে নিজে পরনারীর হৃদয় লেহন করতে অস্বস্তি বোধ করলে না?

খালেদ। রমীজুদ্দিনের দেয়া একটি প্রচারপত্র সামনে ছিলো। অপর পৃষ্ঠায় তারেকের মনের কথা লিখে দিলাম।

সোহরাব। কাকে লিখলে। মনের মধ্যে যাকেই এঁকে থাকো না কেন, পত্রে সম্বোধন করলে কাকে!

খালেদ। মীর মোশাররফ হোসেনের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাসের একটা অংশ আগের দিন ক্লাশে অধ্যাপকের মুখে শুনে এসেছিলাম। তার নায়িকার নাম বসিয়ে দিলাম–'তাহমিনা'।

সোহরাব। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আর অন্য কোনো নাম খুঁজে পেলে না? এ নাম যে কার, কতো কাছাকাছি সে-কথা একবারও তোমার মনে উদয় হয়নি?

খালেদ। পত্রের পূর্ণতার জন্য শেষে নাম সই করলাম 'রুস্তম'।

সোহরাব। তুমি সোহরাবকে বলছো যে তুমি রুস্তমের জবানীতে পত্র লিখে দিলে। তুমি শয়তানের শিরোমণি। ঠিক জেনো আমি তোমাকে নরকাগ্নিতে পুড়িয়ে মারবো। কী সাংঘাতিক! হয়তো মিস মীনা মিনহাজ সে খাতা অসাবধানে ফেলে রেখেছে। খাতাটা গিয়ে পড়লো মিস রুমা জোয়ারদারের হাতে। ভাবতে পারো সে মহিলা কি করবে ঐ চিঠি নিয়ে? মীনার পুলিশ অফিসার বড় ভাইয়ের কাছে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেবে। আমাকে অপদস্থ করবার জন্য হয়তো গোটা পত্রটাই সাইক্লোস্টাইল করিয়ে মেয়েদের হোস্টেলের ঘরে ঘরে কপি পৌঁছে দেবে।

(বাইরে সমস্বরে আওয়াজ ওঠে : ছা আ ত্র ঐক্ ক অ! জিন্দাবাদ! আ মা দে এ র দাবী, মানতে হবে!! পরীক্ষার তারিখ, পেছাতে হবে!! ইত্যাদি। তারপর দরজায় কয়েকবার ঠক্‌ঠক্ করে ঢুকে পড়ে রমীজ, আফতাব, খয়ের।)

রমীজ। আপনারা এখনও খেতে যাননি!

সোহরাব। এইবার যাবো। সব শেষ হয়ে গেছে।

রমীজ। আমাদের কাজও আমরা অনেক দূর গুছিয়ে এনেছি।

সোহরাব। একটুখানি আবার ফেলে রাখলেন কেন?

রমীজ। সে-কথাটাই আপনাকে জানিয়ে যেতে এসেছি। হিসাব করে দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত তবু হয়তো সামান্য গুটি কতক ছেলেমেয়ে আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করতে পারে।

সোহরাব। পারে।

রমীজ। ঠিক করেছি, তাদেরকে আমরা খতম করে দেবো।

সোহরাব। তার অর্থ?

রমীজ। প্রাণে নয়, শুধু পরীক্ষার্থী নাম ঘুচিয়ে দেবো। গতকাল থেকে আমরা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে শুরু করেছি। যারা আমাদের বিরোধিতা করবেন আমরা তাদের জরুরী বই-খাতা ইত্যাদি গায়েব করে দেবো। আপনারা কি পরীক্ষার তারিখ পেছাবার পক্ষে না বিপক্ষে!

সোহরাব। অসম্ভব! হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দল ভারী করতে চান?

রমীজ। অযথা ত্রাস সৃষ্টি করা আমাদের টেকনিক নয়। যা করার তা আমরা সরাসরি করে ফেলি। শুনেছি কাল বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো কারো নাকি কিছু মূল্যবান নোটখাতা খোয়া গেছে।

সোহরাব। কার?

রমীজ। খাতুনের নাম মিস মীনা মিনহাজ!

সোহরাব। মিস মীনা মিনহাজ?

(সমস্বরে আওয়াজ তোলে আগন্তুকের দল : ছা আ ত্র ঐক্ক্য ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে কাতার দিয়ে বার হয়ে যায়)

সোহরাব। (তারেককে) আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আমার খাতা আমাকে ফেরৎ দিতে না পার, তোমার পরীক্ষার্থী নাম, ওরা নয়, আমি একা ঘুচিয়ে দেবো।

তারেক। ও খাতা এখন কার হাতে গিয়ে পড়েছে তা আমি কি করে মালুম করবো! তাছাড়া তোমার তো কোনো নালিশ এখন আর থাকা উচিত নয়। তোমার খাতা পড়ে বেশী নম্বর পাওয়ার পথ অন্যের কারসাজিতে বন্ধ হয়ে গেলো! তুমি আনন্দ করো।

সোহরাব। আর তুমি? তুমি শোক করতে বসবে, না? পত্র পাঠ তোমাকে পত্র প্রেরক বলে সন্দেহ করে তিনি অবৈধ পুলকে শিউরে উঠতে

পারতেন, সে মওকা বুঝি ফশকে গেলো! কী আফসোস! (খালেদকে) সকল নষ্টের গোড়া তুমি। যদি কালকের মধ্যে পত্রোদ্ধার করতে না পারো, কঠিন পরিণতির জন্য তৈরী থেকো।

খালেদ। যে-কোনো একটা পরিণতির জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতেই হবে। মনে করো মিস মীনা মিনহাজ পত্রটা ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছে। ভাষা এবং হাতের লেখা দেখে ধরে ফেলেছে আসল নিবেদনকারী কে! তখন আমার দশা কি হবে?

তারেক। কেবল যে যার নিজের কথা ভাবছো। খাতা আমার কাছ থেকে নিয়েছে। অবশ্যই সন্দেহ করবে যে আমিই পত্রনিবেদন করেছি। তখন আমার কি দশা হবে? ভেবেছো সে-কথা কেউ?

সোহরাব। তোমরা সব অকারণে বিপদ কল্পনা করে পুলকিত হচ্ছো। মিস্ মীনা মিনহাজকে তোমরা কেউ চেন না। আমার যে খাতা তিনি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যেই পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি জানি আমার আর নিস্তার নেই।

(দৃশ্যের আরম্ভের ঘণ্টাধ্বনি মৃদুভাবে শুরু হয়েছে। সোহরাবের উক্তির শেষাংশ নিমজ্জিত করে ঘণ্টাধ্বনি আমাদের কর্ণপটহ ছিন্ন করে ফেলতে চায়।)

পরীক্ষায় আমাকে পদানত করে উনি উচ্চতর স্থান দখল করবেন। আমার সর্বপ্রকার প্রতিরোধের প্রাকার বিধ্বস্ত করে দিয়ে আমাকে অনুগত দাসে পরিণত করবেন। আমার সকল কর্মাদর্শ চৌচির করে দিয়ে আমাকে এক অতি সন্তুষ্ট গৃহপালিত কর্মচারীতে রূপান্তরিত করবেন। কিন্তু ক্ষমতা থাকতে এ আমি কিছুতেই বরদাশত করবো না। আমি প্রতিবাদ করবো। আমি আওয়াজ তুলবো। আমি পুলিশে খবর দেবো। আমি থানায় গিয়ে ডায়রী করিয়ে আসবো যে, আমার খাতা খোয়া গেছে। আমি তোমাদের কোনো বাধা মানবো না। আমি এক্ষুনি থানায় যাবো। আমার সর্বস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই খামোশ থাকবো না। না না, আমি যাবোই যাবো। যাবো! পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ!

ঘণ্টাধ্বনি প্রচণ্ডতম। তারেক, খালেদ সোহরাবকে একরকম চেপে ধরে রাখে। সোহরাবের কণ্ঠ শোনা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় যে সে আর্তনাদ করছে। পর্দা পড়বে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সকাল বেলা। মীনাদের বাড়ী। মীনার অভিভাবক ও বড় ভাই পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান পরিপূর্ণ সরকারি পোশাকে কারো জন্য অপেক্ষা করছে। স্বাস্থ্যবান অপত্নীক মধ্যবয়সী সুপুরুষ। প্রবেশ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান। দু'দিন হলো দাড়ি কামাননি, যে ফুলপ্যান্ট পরে শুয়েছিলেন–সেটা পরে ছুটে এসেছেন)

আসাদ। এসো, অধ্যাপক এসো। বসো। তারপর খবর কি? কেমন আছো? তোমরা হলে পণ্ডিত মানুষ, তরুণের শিক্ষক। তোমরাই হলে জাতীয় উন্নতির আসল কারিগর। দু'দণ্ড বসে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেও চরিত্রের উন্নতি ঘটে।

হাসান। বাজে বকো না। সারাটা ছাত্রজীবন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। তোমার চরিত্রের এক চুল এদিক-ওদিকে করতে পারিনি।

আসাদ। না পারলেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলে।

হাসান। সে চেষ্টা চিরকাল চালিয়ে যাবার মতো চরিত্রবল আমারও নেই। আমি অন্য একটা জরুরী কাজে এসেছি।

আসাদ। নিশ্চয়ই জরুরী। নইলে সাত সকালে টেলিফোন করে ছুটে আসবে কেন? তবে কি না, তোমাদের জরুরী অবস্থার সঙ্গে আমাদের দুনিয়ার জরুরী অবস্থার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যে-সব কারণে তোমরা প্রবলভাবে উত্তেজিত হও, সেগুলোর সংসর্গে আমাদের নিদ্রাকর্ষণ ঘটে।

হাসান। সুখে আছো। অষ্টপ্রহর চোর-ডাকাতের সঙ্গে ওঠবস কর। ইচ্ছে হবা মাত্র ওদের এক প্রস্থ ডাণ্ডাপেটা করে নিলে। ওরাও কিছু ঠাণ্ডা হলো, তোমার চিত্তও কিছু সাফ্‌সুতরা হলো। আমাদের সংকট তোমরা বুঝবে কি করে?

আসাদ। তোমাদের আবার সংকট কি? কাজ করো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন না হয় প্রক্টর হয়েছো, কিন্তু তাই বলে তো তুমি আর পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব নাওনি! তুমি মূলতঃ অধ্যাপক। দেশের সত্যিকারের কবি, নেতা, কারিগর সব তোমাদের পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কী নোবেল প্রফেশন, আর তুমি কি না আমাদের চাকরীর সঙ্গে তোমাদের মহান দায়িত্বের তুলনা করছো?

হাসান। নোবেল প্রফেশনের নিকুচি করি। চোর-ডাকাতের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিজে সুখে আছো। দিন দিন স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে, মনের ফুর্তি বাড়ছে। আর আমার দশা লক্ষ্য করেছো?

আসাদ। সৎসঙ্গ তোমার সহ্য হচ্ছে না!

হাসান। রসিকতা ফেলে রাখো। তুমি জানো না এই উনিশ-কুড়ি বছরের পড়ুয়া ছেলেমেয়েগুলো কী সাংঘাতিক জিনিস। সব ঘূর্ণমান আগুনের ভেলা। যাবতীয় উদ্ভট চিন্তার ডিপো। কোনো দু'জনের আচরণ এক রকম নয়। কোনো একজনের দুটো আচরণ এক রকম নয়। সাধ্য কি আগে থেকে তুমি কোনো কাণ্ড আঁচ করো। যে ছেলে বাড়িতে কাঁটা বেছে মাছ খেতে জানে না, রাস্তায় নেমে সে ছেলেই বেয়োনেটের সামনে বুক পেতে দেয়। ক্লাসে মাস্টারের সামনে বসে থাকে ভীরু শশকের মতো, বাইরে সহপাঠিনীর সামনে নিজের বীর্যবান পৌরুষ জাহির করতে গিয়ে কী যে বলে আর না বলে তার কোনো মা-বাপ নেই। যেমন হয়েছে ছেলেগুলো, তেমনি মেয়েগুলো।

আসাদ। তোমার মতো পড়াশুনোয় মতিগতি থাকলে আমি এখনও ওদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে চাইতাম।

হাসান। তোমার মন নিতান্ত অশিক্ষিত। স্কুলে যে পর্যন্ত শেখানো হয়েছিলো তারপর আর এক পাও নিজ বুদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারোনি। সম্ভবতঃ খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়ো না।

আসাদ। কিছু কিছু পড়ি। আইন-আদালত, খুন-খারাবী, ছেলেধরা এসব উল্টেপাল্টে দেখি বৈ কি।

হাসান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে মেম্বররা এ্যাসেম্বলী ফাটিয়ে দিয়েছেন।

আসাদ। তোমরা ক্লাশে গর্জাও, ছাত্ররা আমতলায়, অফিসাররা অফিসে। বেচারা নেতাদের হুংকার ছাড়বার জন্য নাগরিকদের তরফ থেকে পরিষদ-ভবন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয়।

হাসান। সে গর্জনে আমি ঘায়েল হতে বসেছি। টেলিফোনে টেলিফোনে ঝাঁঝরা হয়ে গেলাম। সবাই আমার কাছে জানতে চাইছে প্রকৃত অবস্থা কি? কেউ শাসাচ্ছে, কেউ পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ পিলে চম্‌কানো নতুন নতুন খবর সরবরাহ করছে। আমাকে সাহায্য না করলে আমি পাগল হয়ে যাবো। শুনেছি সরকার নাকি তোমাকেই এ ব্যাপারে তদন্ত করবার ভার দিয়েছে।

আসাদ। বাজে কথা। তা'ছাড়া আমি কি করে তোমাকে সাহায্য করবো? বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানার মধ্যে খাকি সুতো ঢুকবার যো নেই।

নজরে পড়লেই ভস্ম করে দেবে। তোমাদের কোন কারবারের মধ্যে আমি থাকছি না। আমার চোর-ডাকাত বেঁচে থাকুক!

হাসান। কিন্তু তোমাদের থানা আমাদের ছাড়ছে না। সক্‌কাল বেলা আমাকে একজন টেলিফোন করে জানিয়েছে যে আমাদের কোন্ ছাত্র নাকি থানায় গিয়ে এক অভিযোগ ডায়রী করিয়ে এসেছে।

আসাদ। কিসের অভিযোগ?

হাসান। খাতা চুরির। কে বা কারা নাকি তার মূল্যবান নোটখাতা চুরি করেছে। এতে নাকি সে পরীক্ষায় বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, চোর বহুল পরিমাণে লাভবান হতে পারে। টাকার অঙ্কে এই লাভক্ষতি হিসাব করে ডায়রীতে লিখিয়ে এসেছে।

আসাদ। ডাকাত ছেলে। কি নাম?

হাসান। সোহরাব।

আসাদ। আমাদের মীনার সহপাঠী?

হাসান। এতক্ষণে কিছু কিছু তোমার মাথায় ঢুকেছে। আমি জানি তোমার বোন আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। ছেলেদের ভীড়ের মধ্যেও একটা সহজ মর্যাদাবোধ নিয়ে চলতে জানে। ওর স্বভাবের সূচিতা ও কাঠিন্যই ওকে যাবতীয় অন্তরঙ্গতার আবিলতা থেকে রক্ষা করবে। মিস্ মীনা মিনহাজ মিস্ রুমা জোয়ারদারের মতো নয়। কিন্তু তবু হুশিয়ার থাকতে হবে। এই সোহরাব-টোহরাব একেবারে বর্বর অসুর। আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি ওর কথাবার্তা আদৌ ধারাবাহিক নয়। কারো প্রতি ওর কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। স্ত্রী-পুরুষ, মিত্র-মুরুব্বি–ও কোনো রকম বাছবিচার করে চলে না। হয়তো মীনাকেই চোর বলে অভিযুক্ত করতে চাইবে।

আসাদ। আমাকে কি করতে হবে?

হাসান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তোমাকে তৎপর হতে হবে।

আসাদ। কভি নেহি।

হাসান। তোমার বোন বিপদাপন্ন হলে তুমি এগিয়ে আসবে না?

আসাদ। না। তবে বোনের বান্ধবীদের কেউ হলে আসতেও পারি।

হাসান। তুমি জানো না বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বর্তমান হপ্তায় কী ভয়ঙ্কর রকম থম্‌থমে। ছাত্রদের এ-দলে ও-দলে যে-কোনো মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। তার চাপে পড়ে আমি সুদ্ধো গুঁড়িয়ে যেতে পারি।

আসাদ। যাও। কার কি এসে যাবে। দুনিয়া একটা জ্ঞানী লোকের ভারমুক্ত হবে। মীনা লায়েক হয়েছে। যদি চুরি করে থাকে এবং ধরা পড়ে, তাহলে তার নিস্তার নেই। আমার হাতেই কঠিন

সাজা পাবে। আর যদি না করে থাকে তবে সাধ্য কি কেউ তার ক্ষতি করে। আর তুমিও ঠিকই থাকবে। না থাকতে পারলে এত লেখাপড়া শিখেছো কেন?

হাসান। তুমি আমাকে কোনো রকমেই সাহায্য করতে রাজী নও?

আসাদ। না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখনও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বেশী ভাবতাম না। বিশ্ববিদ্যালয় বিসর্জন দিয়ে এসে এতদিন পর আজ তার ভাবনা বয়ে বেড়াবো, তেমন আহাম্মক আমি নই।

হাসান। বেশ। আমি চলি তা'হলে।

আসাদ। চা খেয়ে যাও। সবাই এক্ষুনি উঠে পড়বে।

হাসান। থাক, আরেক দিন আসবো। (বেরিয়ে যায়।)
(সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা পড়ে) কে?

(ভঙ্গিমা সহকারে প্রবেশ করে মিস রুমা জোয়ারদার)।

রুমা। আমি, মিস্ রুমা জোয়ারদার।

আসাদ। সে কি! এত সক্কাল বেলা!

রুমা। আরো সকালে এসেছিলাম। দরজার কাছে এসে ফিরে গিয়েছি।

আসাদ। ঢুকলেন না কেন?

রুমা। বাব্বাঃ! গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলাম খোদ প্রক্টর সাহেব ঘরের মধ্যে আছেন।

আসাদ। আপনি কাউকে ভয় পান, জানতাম না।

রুমা। ভয়? পুরুষ মানুষ দেখে ভয় পেতে যাব কেনো?

আসাদ। পালিয়ে গেলেন কেনো?

রুমা। পালিয়ে যাইনি। একটা দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য আড়ালে সরে গিয়েছিলাম।

আসাদ। দুর্ঘটনা?

রুমা। আমার আবির্ভাব সব সময়েই ওঁর জন্য একটা দুর্ঘটনা। প্রক্টর সাহেব আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

আসাদ। আপনার অপরাধ?

রুমা। আমি নাকি বেশী নড়াচাড়া করি। চুপ করে বসে থাকলেও নাকি আমার অঙ্গ নড়ে। মাথার ওপর থেকে কাপড় পড়ে যায়। কাঁধের ওপরেও থাকে কি থাকে না। তার ওপর যখন হাসি তখন জোরে শব্দ হয়। অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর আমার সবসময় খুব হাসিও পায়। শুনেছি এই সব কারণে প্রক্টর সাহেব আমাকে আদৌ সহ্য করতে পারেন না। আমার

নৈকট্য অনুমান করতে পারলেই ওঁর দাঁতে কিড়মিড় লেগে যায়। চোখ দিয়ে আগুন ঝরে। মাথার চুল দাঁড়িয়ে যায়।

আসাদ। ঢুকে পড়লেন না কেন, দৃশ্যটা একটু দেখতাম।

রুমা। শত হলেও মেয়ে মানুষ। গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম উনি বড় রকমের বিপদে পড়েছেন। আরো বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া অন্যায় হতো। মীনা কোথায়?

আসাদ। এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

রুমা। আমি গিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছি।

আসাদ। খবরদার, ও-কাজ করবেন না। রেগে গেলে ওর একদম কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ওর ঘুম ভাঙ্গালে ও নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে।

রুমা। কিন্তু আমার যে কিছুতেই তর সইছে না। যে কথাটা বলার জন্য ছুটে এসেছি সেটা ওকে তাড়াতাড়ি বলতে চাই।

আসাদ। আমাকে বলুন।

রুমা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, আপনি বুঝবেন না। আপনি আপনার কাজে যান। আমি একাই অপেক্ষা করবো।

আসাদ। আপনি ভুল বুঝবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে আমি ভালবাসি। সে-সব কথা আলোচনা করতে আমি খুবই ভালবাসি। আপনার সঙ্গে যদি কোনো কোনো কথা পরিষ্কার করে নিতে পারি, তা'হলে, মানে, ভালো হতো।

রুমা। কি জানতে চান আপনি?

আসাদ। কোনো প্রশ্নের জানা না জানার কথা বলছি না। মানে, মীনা হলো আমার ছোট বোন, প্রক্টর হাসান আমার বাল্য বন্ধু। মীনাকে সব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। হাসান সব প্রশ্নকে আমল দিতে চায় না।

রুমা। আপনি জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল চুরি হয়?

আসাদ। হবে না কেন? সেখানকার এক একটা আইডিয়ার দাম লক্ষ কোটি টাকা। এক একটা হৃদয় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রসে পরিপুষ্ট। চুরি রাহাজানি এখানে হওয়াই তো স্বাভাবিক।

রুমা। আমার কপাল মন্দ, তাই সেখানে আমাকে কেউ এত মূল্যবান মনে করে না। নইলে কবে, আপনার ভাষায়, একটা না একটা খুন বা রাহাজানির মধ্যে পড়ে যেতাম।

আসাদ। ছেড়ে দিন। ও-রকম মহাবিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে আসুন। যারা এত অন্ধ এবং প্রাণহীন তাদের মধ্যে পড়ে রয়েছেন কেন? (একটু দূরে ধ্বনি ওঠে : ছা আ ত্ ত্র ঐ ক্ ক্য ইত্যাদি।

আমাদের দাবী মানতে হবে, পরীক্ষার তারিখ পেছাতে হবে–এই দাবীও শোনা যাবে) ও কিসের শব্দ?

রুমা। মহাবিদ্যালয়ের যারা মহাপ্রাণ স্বরূপ তাঁরাই দল বেঁধে আপনার এখানে আসছেন।

আসাদ। আমার কাছে কেন?

রুমা। আপনার বোনের কাছে আসছে। আমার কাছে যখন আসছে না তখন আমিও ওদের সামনে পড়তে চাই না।

আসাদ। চলুন আমরা দু'জনেই সরে পড়ি।

রুমা। পাগল হয়েছেন। ওদের বিদেয় করবে কে তা'হলে? আপনি এখানে চুপ করে বসে থাকুন। বসে বসে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভাবেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মাত্র। আমাকে অনেক দেখেছেন। ওদেরকেও দেখেন। আমি মীনার ঘরে বসি।

আসাদ। চুরির কথাটা শেষ করে গেলেন না?

রুমা। ওহ্। কে বা কারা গতকাল বিকেলে মীনার খাতা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আসাদ। কার খাতা?

(নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠের স্লোগান : ছা আ ত্ ত্র ঐ ক্ ক্য অ! ইত্যাদি। দরজায় কয়েকবার টোকা দিয়ে রমীজ, আফতাব, খয়ের প্রমুখ প্রবেশ করে। রুমা তার আগেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে।)

রমীজ। আস্‌সালামো আলাইকুম। আমরা মিস মীনা মিনহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

আসাদ। মীনা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। আপনাদের কি খুব জরুরী দরকার?

রমীজ। উনি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমান নাকি?

আফতাব। আপনি তার অভিভাবক হয়ে এসব অভ্যেস অনুমোদন করেন?

আসাদ। বেশী রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করলে অনেক সময় পরদিন সকালে বিছানা ছাড়তে দেরী হয়। আমার নিজেরও প্রায় এই রকম অভ্যাস। বুঝতেই পারেন, আমরা যা পেশা তাতে অনেক সময়ই দিনের চেয়ে রাতে কাজের চাপ পড়ে বেশী।

রমীজ। আপনাকে দেখে সে-রকম মনে হয় না।

আসাদ। আজ সূর্য না উঠতেই যে একেবারে সাহেব সেজে বসে আছি তার আসল কারণ আপনাদের প্রক্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান সাহেব। এক রকম উনিই জোর করে বিছানা থেকে টেনে তুলেছেন।

আফতাব। আমরা জানতাম তিনি এখানে আসবেন। কিন্তু এতে আমরা ভয় পাই না। আমরা জানি যে গোপনে গোপনে কর্তৃপক্ষ আমাদের শায়েস্তা করবার জন্য পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আমরাও তার জন্য প্রস্তুত। লাঠি, গুলি, বেয়নট সব আমরা বুক পেতে নেবো। আমাদের ঐক্য অটুট। আপনাদের টিয়ার গ্যাস আমাদের সামনে পড়লে ফেটে লাফিং গ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ছা আ তক ত্র ঐ ক্ ক্য অ!

(বার থেকে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি : জিন্দাবাদ! ইত্যাদি।)

খয়ের। বাড়ীর ভেতর লোকজন ঘুমুচ্ছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের এ-রকম বিকট আওয়াজ তোলা হয়তো সঙ্গত হচ্ছে না।

রমীজ। বেলা দুপুর পর্যন্ত যিনি বিছানায় পড়ে ঘুমুতে পারেন তাঁর জন্য দরদে উথলে ওঠা তোমার পক্ষেও খুব শোভনীয় হচ্ছে না। আপনি একবার মিস্ মীনা মিনহাজকে ডেকে দেবেন কি?

আসাদ। প্রক্টর হাসানের ওপর বেশী অবিচার করেছেন। দিন-রাত লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলেই যে তাঁর কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট নেই এ কথা সত্য নয়। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন নিতান্তই এক প্রাচীন বন্ধু হিসেবে। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার পুলিশ বাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব একবারও করেননি।

আফতাব। এ কি বিয়ের প্রস্তাব নাকি যে মুখ খুলে বলতে হবে। সখ্য যেখানে প্রাচীন সেখানে কেবল ইশারায় দুনিয়া এসপার-ওসপার হয়। আমরা ছাত্র বটে, কিন্তু কিছুই শিখিনি এমন কথা ভুলেও ভাববেন না।

রমীজ। মিস্ মীনা মিনহাজকে কি আপনি ডেকে দেবেন, না আমরা ওঁকে স্লোগান তুলে আহ্বান জানাবো?

(হাতে একটা খাতা নিয়ে মিস রুমা জোয়ারদার ঢুকবে)

রুমা। যদি আমাকে দিয়ে চলে তবে আমি হাজির আছি।

(সবাই সোৎসাহে সম্ভাষণ জানায়)

রমীজ। আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।

রুমা। এখনও অন্য রকম ভাববেন না। আমাকে পথে পেয়ে কিছু বলে নেবেন, তা চলবে না। আমাকে কিছু বলতে হলে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। এখানে যতজন এসেছেন সবাইকে দল বেঁধে যেতে হবে। একজন কম হয়েছে কি দেখা দেবো না।

আফতাব। সে রকম আশংকা করা বৃথা। পেছনে পড়ে থাকতে রাজী হবে কে?

রমীজ। আমরা মিস্ মীনা মিনহাজের জন্য অপেক্ষা করছি।

রুমা। তা'হলে আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। উনি সবে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে প্রথম আড়মোড়া ভাঙ্গলেন।

খয়ের। ততক্ষণে অন্য কোনো জায়গা থেকে ঘুরে এলে হতো না?

রমীজ। খামোশ। সফরে বেরুবার আর মওকা খুঁজে পেলে না? না। আমরা অপেক্ষা করবো।

রুমা। তা করতে পারেন। মীনাকে এক নজর দেখবার জন্য সকল জনতাই অপেক্ষা করতে রাজী হয়। এ ব্যাপারে পাস-কোর্স কি অনার্স-কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য লক্ষ্য করিনি।

আফতাব। আমরা এম-এ ক্লাশের ছাত্র।

রুমা। মিস্ মীনা মিনহাজের মন জানাই যদি আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন? মিস্ মীনা মিনহাজ আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। জিজ্ঞেস করুন, আমি সব কথার জবাব দিতে পারবো।

রমীজ। মিস্ মীনা কি পরীক্ষা পেছাবার পক্ষে না বিপক্ষে?

আসাদ। এক শ'বার বিপক্ষে।

আফতাব। মিস্ মীনা মিনহাজ স্বাধীন জেনানা। আমরা তাঁর মত শুনতে চাই।

রুমা। মিস্ মীনা মিনহাজেরও তাই মত। তবে মীনার তরফ থেকে এটুকু না বললে অন্যায় হবে যে, তাঁর এ সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাব কোনো রকমে ক্রিয়াশীল ছিলো না।

আফতাব। আমরাও তাঁর কাছ থেকে এ-রকমই আশা করেছি।

রমীজ। কার চক্রান্তে পড়ে তিনি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানতে পারি কি?

রুমা। সেটা আপনাদেরই কোনো এক ছাত্র-বন্ধুর দল। যাঁরা মিস্ মীনা মিনহাজের অকৃত্রিম স্তাবক, ভক্ত, উপাসক, চারণ।

খয়ের। তাঁরা সংখ্যায় একজন নন?

রমীজ। হয়তো শেষ পর্যন্ত একজন। কিন্তু এখনও ত্রয়ী। আমি এঁদের চিনেছি। কিন্তু আপনার তরফ থেকে এসব অভিযোগের কোনো প্রমাণ আছে?

রুমা। অভিযোগ হতে যাবে কেন? এত খোলাখুলি কারবার। ওঁদের মধ্যে যিনি সেরা তিনি নানারকম পাঠ-নির্দেশসহ তাঁর নোটখাতা মীনার কাছে পাঠিয়েছেন। মীনা নিশ্চয়ই নিজেরটা ওঁর কাছে পাঠিয়েছে। পরীক্ষা দেবার জন্য কি রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছেন তো?

রমীজ। আপনার হাতে ওটা কার খাতা?

রুমা। (খাতা খুলে নাম পড়ে) সোহরাব হোসেন।

রমীজ। আপনি কোথায় পেলেন?

(রমীজ ও আফতাব ক্রমশ রুমাকে ঘিরে ধরবে)

রুমা। মিস্ মীনা মিনহাজের বিছানার ওপর। তাঁর বালিশের পাশে।

আফতাব। এ খাতা আপনি আমাদের হ্যান্ডওভার করে দিন।

আসাদ। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখেছি। আর দেখতে চাই না। আপনারা দু'জন আরো সরে দাঁড়ান। মিস্ রুমার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছেন কি, আমি সত্যি সত্যি আপনাদের হাজতে চালান দিয়ে দেব।

আফতাব। আপনি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন? দেশের গোটা ছাত্রশক্তি আমাদের পশ্চাতে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা তরুণরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমরাই হলাম আগামী দিনের পরিষদ সদস্য, জাতীয় মন্ত্রী, দেশের শাসনকর্তা!

রমীজ। আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী সৌজন্য আমরা প্রত্যাশা করিনি। জানতাম যে এক সময় না এক সময় আপনার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বেই। কিন্তু আমাদেরও আপনি সামান্য শক্তি বলে মনে করবেন না। আপনার বোন মিস মীনা মিনহাজ যে অন্য রকম হবে আমাদের সে-রকম আশা করা উচিত হয়নি। আপনার উত্তেজিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এক্ষণি চলে যাচ্ছি। মিস রুমার সঙ্গে দু-একটা কথা শেষ করেই আমরা চলে যাব।

রুমা। তা হবে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে আমার বাড়ী যেতে হবে। আদাব।

রমীজ। বেশ। তাই হবে। আমরা আসি তা'হলে।

(ছাত্র ঐক্য ইত্যাদি ধ্বনি তুলে সদলবলে প্রস্থান)

আসাদ। মীনার বিরুদ্ধে এসব কথা ওদের বলতে গেলেন কেন?

রুমা। একশ'বার বলব। যতবার দেখা হবে ততবার বলব। আমার সঙ্গে ও ছলনা করল কেন?

(ভেতর থেকে মীনা ও বার থেকে প্রক্টর ধীরে ধীরে ঢুকবেন। রুমা ও আসাদ মীনাকে দেখেনি।)

হাসান। যাক, সহিসালামতে আছ। যে-রকম বজ্রনিনাদে স্লোগান তুলছিল তাতে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরা কি করল? কি বলছিল?

আসাদ। মীনা আপনার সঙ্গে কি ছলনা করেছে?

রুমা। সন্ধ্যার সময় আমাকে চিঠি লিখে জানালো ওর নাকি কি একটা দামী নোটখাতা চুরি গেছে। এখানে এসে দেখি উনি নিজেই আরেক জনের খাতা চুরি করে সেটা বুকে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

মীনা। আমি কারো খাতা চুরি করিনি।

রুমা। এটা চুরি, না রাহাজানি, না অন্য কিছু তোমার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও। ওঁর এসব কথা ভাল করে জানা আছে।

হাসান। কি বললে? সোহরাবের খাতা মীনা চুরি করেছে?

আসাদ। আহা, তুমি আবার মাঝখান থেকে উল্টোপাল্টা কথা বলে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো করে তুলো না।

রুমা। সোহরাবের টিউটোরিয়াল খাতা একবার পড়ে দেখবার জন্য আমরাও কম সাধ্য সাধনা করিনি। কখনো সোহরাবের কাছ থেকে আদায় করতে পারলাম না। আর যে মীনা সোহরাবের সঙ্গে ভুলেও কোনো দিন হেসে কথা কয়নি, সেই মীনাই কিনা পরীক্ষার আগে সোহরাবের খাতা পেয়ে গেল! পেয়ে গেল মানে সোহরাব মীনাকে তার খাতা চুরি করতে দিল। বিনিময়ে নিশ্চয়ই মীনাও তার খাতা সোহরাবকে চুরি করতে দিয়েছে। নইলে খাতার মধ্য দিয়ে এত রকম চিঠি পারাপার হবে কেন? আর বিপদের ভান করে আমাকে চিঠি দেয়া হয়, 'তাড়াতাড়ি এসো সখি, আমার খাতা চুরি গেছে।' সোহরাব মীনাকে কি লেখে তার নমুনা দেখেছেন আপনারা? আপনিই ওর প্রকৃত অভিভাবক, একবার ভাল করে পড়ে দেখুন।

(খাতার মধ্য থেকে পত্র বার করে আসাদের হাতে তুলে দেয়। একটা ছাপানো প্রচারপত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় কলম দিয়ে লেখা একটি পত্র)

মীনা। ভাইয়া, তোমার পায়ে পড়ি, এ চিঠি পড়ো না তুমি। এ পত্র আমাকে লেখা নয়, কে জানে কাকে লেখা, কে জানে কে লিখেছে–পড়ো না দোহাই তোমার, পড়ো না।

হাসান। (ছাপানো অংশ দেখে নিয়ে) আরে এ যে দেখছি আরেকটা লিফলেট। এটা কখন ছাপল? এটা তোমরা কোথ্থেকে পেলে?

(থাবা দিয়ে নিয়ে নেয় ও ছাপানো দিক পড়তে থাকেন।)

রুমা। (থাবা দিয়ে নিয়ে নেয়) ছাত্রদের বিরুদ্ধে দালালী করবার জন্য আমি লিফলেট সংগ্রহ করি না। আপনাকে আমি ছাপানো দিক পড়তে দেবো না।

আসাদ। আমি উল্টো দিকের হাতে লেখা অংশ পড়ব। আমাকে দিন।

(হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল)

মীনা। আমার খাতা ফিরিয়ে দাও।

রুমা। এতই আপন হয়ে গেছে নাকি? পরের খাতা বলে বুঝি আর উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

(প্রক্টর হাসান তখন মাথা নিচু করে আসাদের হাতে ধরে রাখা লিফলেটটা পড়ে নিচ্ছেন। হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে গাদা গাদা লিফলেট বার করে একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করে দেখছেন)

মীনা। খাতাটা ফিরিয়ে দাও।

রুমা। তোমার কাছ থেকে নিয়েছি প্রমাণ কি? এ খাতা চুরির মাল। এ আমি থানায় জমা দেব।

হাসান। কার খাতা? সোহরাবের খাতা পাওয়া গেছে? এই খাতার জন্য সে ডায়রী করিয়ে এসেছে?

(প্রক্টর হাসান এগিয়ে এসে খাতাটা হাত করতে চায়, মুঠ করে ধরেনও। মীনা ও রুমা এক সঙ্গে অন্যপ্রান্ত চেপে ধরে খাতাটা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।)

আসাদ। হাসান তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? ডিউটি করতে হবে বলে কি শেষে তুমি মেয়েদের সঙ্গে হাতাহাতি করবে?

(আসাদ প্রক্টরকে টেনে সরিয়ে আনে, সেই অবসরে প্রক্টর প্রচারপত্রটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। মীনা আর রুমা খাতার দু'প্রান্ত ধরে রেখে পরস্পরের দিকে অগ্নি দৃষ্টি হানতে থাকে।)

হাসান। (লিফলেট নিয়ে মেঝের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েন) এ লিফলেটটা একটু নতুন ধরনের। তবে ভাষাটা একেবারে যে নতুন তাও মনে হচ্ছে না। আগেও এ রকম দু-একটা বেরিয়েছে। কোথায় যে গেল!

(লিফলেটের স্তূপ হাতড়ায়)

আসাদ। হাসান! ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

মীনা। কিছুতেই দেবেন না স্যার!

হাসান। এই যে পেয়েছি। একেবারে এক ঢং। বুঝলে আসাদ, এই যে শ'-শ' লিফলেট এখানে দেখছ, এগুলো সব পরীক্ষা পেছাবার

মহা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ। বছরের হিসেব ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা পুলিশের লোক এর আসল মূল্য কোনো দিন বুঝবে না। আত্মত্যাগের মহাকীর্তি ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে এই মহান আন্দোলনের ধারা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আন্তরিকতায়, সংঘবদ্ধতায়, উচ্চকণ্ঠিতায় আর সকল জাতীয় আন্দোলন এর কাছে তুচ্ছ। মিউজিয়মের কিউরেটর ডক্টর দানী বলেছেন যে তিনি এগুলো ইস্পাতের মলাটে বাঁধাই করে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রাখবেন। তোমাদের কাছ থেকে এটা না পেলে আমার গোটা সংগ্রহটাই কানা থেকে যেত।

(মীনা চীৎকার করে ওঠে কারণ তার হাতের ওপর আচমকা কিল মেরে রুমা খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মীনা রাগে দিশাহারা হয়ে কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে মারাত্মকভাবে রুমার দিকে এগোয়। রুমা খাতাটা নিজের শরীরে আড়াল করে রেখে পাশে-পেছনে হটতে থাকে। খপ্ করে মীনা তার চুল চেপে ধরে। রুমাও মীনার চুল। ধস্তাধস্তি। চীৎকার। খাতাটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।)

আসাদ। মীনা! মীনা! আশ্চর্য! মীনা থাম্ বলছি। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওর চুল! তুই আমার সামনে কামড়া-কামড়ি করছিস? মীনা!

হাসান। মিস রুমা, ছিঃ! ছিঃ! একি করছ? তুমি আরেকটা মেয়েকে ঘুসি মারছ? তোমরা ভালো চাও তো থাম বলছি। নইলে আমি সত্যি সত্যি রিপোর্ট করে দেব!

(আসাদ মীনাকে টেনে সরিয়ে নেয়। প্রক্টর রুমাকে।)

তুমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

(কাগজপত্র ঠেসেঠুসে ব্যাগের মধ্যে ভরেন)

আসাদ। (মীনাকে) তুমি এখন বাড়ীর ভেতর যাও।

(মীনা পা দিয়ে ঠেলে খাতাটা অন্দর মহলে চালান করে দেয় তারপর নিজে চলে যায়। প্রক্টর রুমাকে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করেন।)

আসাদ। লিফলেটটা রেখে দাও।

হাসান। সব কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে গেছে, এখন খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। এখানেও পড়ে থাকতে পারে, ভালো করে খুঁজে দেখো। আসি এখন। চলো, চলো।

(রুমাকে নিয়ে চলে যাবেন)

তৃতীয় দৃশ্য

(ছাত্রাবাসের আরেকটি কক্ষ। রমীজুদ্দিন চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা মাঝারি রকমের বালতি। পাশের টেবিলে একটা লুঙ্গী দিয়ে কি সব ঢাকা রয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আফতাব একটা আশুকরণীয় কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ গ্রহণ করছে।)

রমীজ। আমাদের আন্দোলন এখন দিনে দিনে গুরুতর আকার ধারণ করছে। অবস্থা গতকাল যে স্তরে ছিল, আজ সেখানে থেমে নেই। অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সোহরাব থেকে প্রক্টর, প্রক্টর থেকে পুলিশ ক্রমে ক্রমে ওদের আঁতাত মজবুত হচ্ছে। স্বচক্ষে সব দেখেছ। আমাদের পেছনে পড়ে থাকলে চলবে না। আমাদের কর্মপন্থাও রোজ একটু একটু করে আরো বেশী আক্রমণাত্মক করে তুলতে হবে।

আফতাব। ডাইরেক্ট এ্যাকশন! ডাইরেক্ট এ্যাকশন ছাড়া কখনও কোনো বড় কাজ সিদ্ধিলাভ করেনি। শুধু শ্লোগান দিয়ে কে কবে রাজ্য জয় করেছে!

রমীজ। আমরা শ্লোগান দিয়ে আরম্ভ করেছি বটে কিন্তু হপ্তা না ঘুরতেই খাতা গাপের এ্যাকশনে নেবে পড়েছি। ধারা ঠিকই আছে, তবে এখন একে আরো এক ধাপ উঁচুতে চড়াতে হবে।

আফতাব। আজ রাতেই এক রাউন্ড হয়ে যাক।

রমীজ। এই সব আয়োজন তো সে-জন্যই। (বালতি দেখায়) আধ বালতি হলেই চলবে। যদি মশারী টাংগানো থাকে তবে তার ওপর ঢেলে দিতে হবে। তিন জনের মধ্যে জানালার ধারের চৌকিতে যিনি শোবেন ধকলটা তাঁর ওপর দিয়েই যাবে। কিছু করবার উপায় নেই।

আফতাব। যদি অত রাতেও তিন জন কন্‌ফারেন্‌সে বসে থাকে।

রমীজ। আমি সেটাও ভেবেছি। বালতিটা হাতে নিয়ে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে জানালার নীচে উঁচু হয়ে বসে থাকবে। আলোচনার খুব একটা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তুমি একটা বিকট হুংকার ছেড়ে উঠে বাল্‌তির মাল ঘরের মধ্যে, ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারবে।

আফতাব। তারপর?

রমীজ। তোমার কোনো ভয় নেই তোমার ঐ হুংকারই হবে আমাদের সিগনাল। মেইন সুইচ্‌বোর্ডে লোক মজুদ থাকবে। তোমার গর্জন শোনামাত্রই বিজলি বিকল হয়ে যাবে।

আফতাব। তার আগেই যদি চিনে ফেলে?

রমীজ। তার জন্যও সাবধান হতে হবে। চোখের নিচে নাকের উপর দিয়ে একটা গামছা খুব করে পেঁচিয়ে বাঁধবে। চেহারাও কিছু ঢাকা পড়বে, গন্ধটাও নাকে কম যাবে।

আফতাব। জিনিসটা যোগাড় করবে কে? তুমি কি জমাদারকে বলে রেখেছ?

রমীজ। সে ব্যবস্থা আমি করব।

আফতাব। তুমি!

রমীজ। আমি আগেও করেছি। কোনো দোষত্রুটি খুঁজে পাবে না।

আফতাব। ওহ্! তা তুমি বললে আমি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমাকেই যখন নিক্ষেপ করতে হবে তখন–

রমীজ। না। তুমি পারবে না। (টেবিলে লুঙ্গীটা তুলে ফেলে। ডিম ও টোমাটোর স্তূপ দেখা যাবে।) টোমাটোগুলো ভাল করে কচ্‌লে তার সঙ্গে অনুপাত মতো পচা ডিম মিশিয়ে খুব করে ফেটাতে হবে। গন্ধ পয়দা করবার জন্য পরে ওর মধ্যে এক দলা গোবর ফেলে ভাল করে ঘুঁটে দেবে। সাধ্য কি অন্য কিছু বলে সন্দেহ করে। তার ওপর যদি আলো নিভে যায় তাহলে তো কথাই নেই!

আফতাব। আমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তোমরা অন্যদিক সামলাও।

রমীজ। অতি উৎসাহে বাড়াবাড়ি করো না। আজ শুধু একটা ঘরে হানা দেবে। পরের দিনের টার্গেট পরে স্থির করব।

আফতাব। সোহরাব! আজ তোমার রুস্তম আমি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হও, মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি কর, সেই দর্পে আমাদের মানুষ বলে গণ্য কর না। আজ দেখ তোমার সোনামুখে কী কালি মাখাই!

রমীজ। একটা রিহার্সাল দাও। তোমার প্রোটা ঠিক হয় কি না দেখি। শেষে হয়ত কেবল হুংকার দেয়াই সার হবে, আসল জিনিসটা কারো গায়ে গিয়ে পড়বে না।

আফতাব। বেশ। একেবারে ড্রেস রিহার্সালই দিচ্ছি।

(নাকের ওপর দিয়ে গামছা পেঁচিয়ে নেয়। গেঞ্জিটা খুলে ফেলে। লুঙ্গীটা গোঁচ দিয়ে পরে।)

রমীজ। খাসা দেখাচ্ছে। (বাল্‌তিটা নিজে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারার টেকনিক দেখায়।) জানালার শিকের একেবারে বেশী গা ঘেঁষে

দাঁড়াবে না। তাহলে হয়ত শিকে ধাক্কা লেগে সবটা মাল উল্টে তোমার গায়ে এসে পড়বে।

আফতাব। একটু দূর থেকে তাক্ করব।

রমীজ। এক ধাক্কায় ছুড়ে মারবে না। মাল থাকবে আধ্ বাল্‌তি। আধা কাত করে ধরে দু-একবার সামনে পেছনে দুলিয়ে হাতের ঝোঁক ঠিক করে নেবে। তারপর হুংকার দিয়ে ঝপাৎ করে সবটা ছুঁড়ে মারবে ঘরের মধ্যে। (দরজায় টোকা পড়ে।) কে?

(নেপথ্যে : আমি খয়ের। রমীজুদ্দিন ততক্ষণে লুঙ্গী দিয়ে টমাটো-ডিম ঢেকে দিয়েছে। আফতাব দরজা খোলে। ঘরের ভেতরের কাণ্ডকারখানা না বুঝতে পেরে খয়ের অবাক হয়ে সব কিছু দেখতে থাকবে। বিশেষ করে বাল্‌তি এবং আফতাবের পোশাক ও ভংগী। আফতাব দরজা বন্ধ করে দেয় এবং বাল্‌তি হাতে তুলে নিয়ে রমীজুদ্দিনের নির্দেশ অনুযায়ী ছুঁড়ে মারার কায়দা অভ্যেস করতে থাকে। খায়ের ঝুঁকে পড়ে দেখে বাল্‌তি খালি, না ভরাট।)

খয়ের। আজ রাতেই হবে নাকি?

রমীজ। আজ হবে না তো কবে? সব শেষ হয়ে গেলে তারপর ছিটাতে চাও নাকি?

খয়ের। মানে, সব যোগাড় হয়ে গেছে?

রমীজ। হবে। ঠিক আছে আফতাব, তুমি পারবে।

খয়ের। যোগাড় করলে কি করে? আজকাল তো সব জায়গায় স্যানিটারী ব্যবস্থা।

রমীজ। সে দায়িত্ব তোমার ওপর দিইনি। চুপ করে বসে থাক। তুমি তোমার কাজের হিসাব দাও।

আফতাব। মিস মীনা মিনহাজের যে খাতাগুলো সরিয়েছ সেগুলো এখনও তুমি আমাদের দেখাওনি। সকাল বেলা যা দেখিয়েছ সে হচ্ছে মিস মীনা মিনহাজের জন্য বেসামাল দরদ।

রমীজ। খাতাগুলো কোথায়?

খয়ের। আছে।

রমীজ। কোথায় আছে?

খয়ের। আমার সঙ্গেই আছে।

আফতাব। বার কর।

খয়ের। টিনের সুটকেসে আছে।

আফতাব। বার কর। (চৌকির নীচ থেকে সুটকেস খুলে চারখানা খাতা বার করে দেয়। রমীজ ও আফতাব সেগুলো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে।) কাণ্ডটা দেখেছ রমীজ! মনে হয় যেন, এখানে এসে অধ্যাপকের এক A-হরফ ছাড়া বাদবাকী বর্ণপরিচয় বেবাক লোপ পেয়েছে। সবগুলো টিউটোরিয়াল রিমার্কই A A A! একেই বলে মুখ দেখে নম্বর! আহা-হা কী আমার অধ্যাপক রে! লম্বাচওড়া কথার ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ওদিকে নিজেরা সব এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই বৃন্দাবনের বাঁশুরিয়া! কো-এডুকেশনের আদত মজা ওঁরাই লুটেছেন আমরা কেবল ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে মরি।

রমীজ। খয়ের, খাতা চারটে কেন? কাল না বললে যে পাঁচটা হাত করতে পেরেছ?

খয়ের। পাঁচটার কথা বলেছিলাম নাকি?

রমীজ। গোটা গোটা পাঁচটা। পাঁচ আঙ্গুলের মত পাঁচটা। একটাও কম-বেশী নয়। এখন চারটে দেখাচ্ছ কাকে?

খয়ের। ওহ্‌। মানে খাতা বলতে চারটেই ছিল। আরেকটা খাতা মানে–মানে, সেটা কোন খাতাই নয়।

আফতাব। বারে বা! তুমি দেখছি একেবারে অধ্যাপকের ঢঙে কথা কইছ। সোজা প্রশ্নের জবাব মারছ কঠিন কঠিন ডেফিনিশন দিয়ে। বলি কোনো মতলব-টতলব নেই তো!

খয়ের। সত্যি ওটা কোন কাজের খাতা নয়। যদি ওটা টিউটোরিয়াল খাতা হ'ত, কি কোনো পেপারের ওপর করা নোট, এমন কি একটা সাজানো গুছানো ক্লাশনোটও হ'ত–তাহলেও কখনও আমার এ-রকম ভুল হ'ত না। কোথায় যে রাখলাম কিছুতেই খেয়াল করতে পারছি না।

রমীজ। আন্দোলনের এই স্তরে পৌঁছে তুমি এখন হঠাৎ বেখেয়ালী হয়ে পড়বে, এ হয় না। আমরা হতে দেব না।

আফতাব। আমি সুটকেসটা আরেকবার ভাল করে দেখি।

রমীজ। খুব ভাল করে দেখ। খয়েরের খেয়াল ফিরিয়ে পাইয়ে দাও।

(আফতাব বিছানার নীচ থেকে পুরানো টিনের সুটকেসটা টেনে বার করে। উপুড় করে দুবার ঝাঁকুনি দেয়। খাতা বার হয় না। তবুও অদৃশ্য খাতা জবরদস্তি বার করবার হিংস্র চেষ্টায় আফতাব ডালা পাকড়ে মাথার ওপর তুলে ধরে প্রচণ্ডবেগে সুটকেসটা মেঝের ওপর আছড়ে মারে। সুটকেসটা দুমড়ে দু'-টুকরা হয়ে যায়। রমীজ ও আফতাবের মুখ আরো কঠিন হয়।)

মিস মিনহাজের বাড়ীতে তুমি যে-রকম করছিলে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে হাওয়া ভাল বইছে না। বোকার মত চুপ করে বসে রয়েছ কেন? ভাল চাও তো খাতাটা বার করে দাও।

খয়ের। এ তোমাদের অন্যায় সন্দেহ। অন্যায় রকমের জিদ। আমি বলছি মিস মিনহাজের এ খাতাটার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। এ খাতা দিয়ে কি করবে?

রমীজ। অন্যগুলোর সঙ্গে বাণ্ডিল বেঁধে পুড়িয়ে ফেলব। এ-রকমই সিদ্ধান্ত ছিল। তুমিও ভিন্ন মত পোষণ করতে না।

আফতাব। পুড়িয়ে ফেলব না তো বাঁধিয়ে রাখব নাকি? ওগুলো হেফজ করে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে চাও?

(খাতার তল্লাশে আফতাব খয়েরের বিছানাপত্র তছনছ করে ফেলে।)

রমীজ। আমরা খাতা চুরি করিয়েছি বটে কিন্তু সে একটা আন্দোলনের জন্য, একটা আদর্শের জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। আমাদের নিজেদের কেউ যদি আজ উল্টো কিছু ভাবতে চেষ্টা করে, তাকে আমরা ছেড়ে দেব ভেবেছ? ভাল চাও তো মিস মীনা মিনহাজের পঞ্চম খাতাটা চট করে বের করে দাও।

খয়ের। মনে করতে পারছি না। কোথায় যে ফেলে এলাম, ঠিক মনে করতে পারছি না।

রমীজ। ওকে একটু মনে করিয়ে দাও।

আফতাব। দিচ্ছি। (বালতি তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

খয়ের। ও কোথায় গেল? ও আমাকে কি করবে?

রমীজ। খাতাটায় কি লেখা আছে?

খয়ের। বিশ্বাস কর, কিছু না, কিছু না, ওটা মিস মীনা মিনহাজের রাফখাতা মাত্র। ওতে কোনো কাজের কথা নেই। সব বাজে বাজে কথা। এক লাইন লিখেছে, তিন লাইন কেটেছে। এর-ওর নাম লিখেছে, ছবি এঁকেছে, ছড়া কেটেছে। পাশের মেয়ের সঙ্গে লিখে লিখে যা তা কথা বলাবলি করেছে, পরে কাটতে ভুলে গেছে। এ খাতা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, পরীক্ষার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ শুধু অসতর্ক উক্তির ঝাঁপি, ওর মধ্যে কোনো লজ্জা, কোনো ডর, কোনো আব্রু নেই। ওটা একটা–

(ঝপাৎ করে এক ঝাপটা পানি এসে ধাক্কা মারে খয়েরের মুখে। নিক্ষেপকারী বাল্‌তিধারী আফতাবকে ঘরের অপর

পাশে দেখা যাবে। খয়ের স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারে যে তার চুল মুখ গড়িয়ে পানি ঝরছে। তবুও হাত-পা নাড়ে না অচেতন পুতুলের মত ঠায় বসে থাকে।)

রমীজ। এতে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে। হয়ত স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে। খাতা বার করতে পারবে। আমরা ততক্ষণে চা খেয়ে আসি। কোন রকম চালাকী করতে চেষ্টা করো না। আমরা বার থেকে তালা দিয়ে যাব। আর এ খাতাগুলো সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ফিরে এসে বাকী খাতাটা পেতে চাই। আল্লাহ করে, ভালোয় ভালোয় যেন তোমার লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আসে।

(আফতাব ততক্ষণে বাল্‌তি রেখে দিয়েছে। দু'জনে বেরিয়ে যাবে। খয়ের অপলক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারে যে বার থেকে তালা বন্ধ করা হয়েছে এবং গৃহসঙ্গীরা চলে গেল। খয়ের উঠে দাঁড়ায়। তারপর তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ মোছে। চুল আঁচড়ায়। একটু ভাবে। এদিক-ওদিক দেখে। রমীজের টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। রমীজের বই খাতার স্তূপ থেকে একটা খাতা বার করে নেয়। হাসে। বসে খাতা খুলে পড়তে থাকে। হঠৎ ঘরের বাইরে দড়াম করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়। ঘরের মধ্যে আংটা সুদ্ধ একটা তালা ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ঘরে ঢুকে সোহরাব। হাতে ক্রিকেট ব্যাট, তার মাথার একটা টুকরো উড়ে গেছে। খয়ের এত হকচকিয়ে গেছে যে হাতের খাতাটা লুকোতে ভুলে যায়।)

সোহরাব। পেয়ে গেছ? আমাকে দিয়ে দাও।

খয়ের। কি দিয়ে দেব?

সোহরাব। খাতাটা।

খয়ের। তোমাকে? কি বকছ?

সোহরাব। ওটা কোনো খাতাই নয়। বাজে খাতা। তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। ওর মধ্যে লেখা কম, কাটাকুটি বেশী। হরফ পরিণত হয়েছে ছবিতে, কথা ছড়ায়। সামান্য কথাটা লিখেছেন দশবার, অসামান্য কথাটা ঢাকবার বৃথা চেষ্টায় সারা পৃষ্ঠা কালিতে লেপটে দিয়েছেন, নখ দিয়ে খুঁটিয়ে উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছেন কারো নাম, কোনো একটা ডাক, একটা সাড়া! তোমাদের আন্দোলনের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই।

খয়ের। এত কথা তুমি জানলে কি করে?

সোহরাব। চা খেয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ তোমাদের ঘরের মধ্যে বাক্স ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ঘুরে গিয়ে তোমাদের ঘরের পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি সব শুনেছি। ওরা চলে গেলে, দৌড়ে গিয়ে অন্য কিছু পেলাম না। (হাতের ব্যাট দেখিয়ে) এইটা দিয়েই তালা ভাঙলাম।

খয়ের। এত কষ্ট কেন করলে?

সোহরাব। খাতাটা আমার দরকার। অন্যের খাতা আগে কোনোদিন দেখিনি। দেখতে চাইনি। কিন্তু আজ চাই। আজ খাতা হাত করতে চাই। খাতার বদলে খাতা। উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

খয়ের। যদি সাহায্য না করি?

সোহরাব। সেটা খুব দুঃখের কথা হবে। কথায় ছাড়া কাজে কোনোদিন আমি কারো সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিনি। কিন্তু আজকে আমি অন্যের ক্রিকেট ব্যাট ভেঙেছি, ঘরের তালা উপড়ে ফেলে দিয়েছি। আজকে আমি আমার কোনো কাজের জন্যই দায়ী নই। বিনা ওজরে খাতাটা আমার হাতে তুলে দাও। আমাকে একটা কিছু করতে বাধ্য করো না। (খয়ের তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে খাতাটা সোহরাবের হাতে তুলে দেয়) আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। তোমার কোনো রকম অনিষ্ট হোক এ আমি চাই না! (মাটি থেকে কুড়িয়ে) ব্যাটের এই ভাঙা টুকরোটা আর এই ওপড়ানো তালা কড়া রইলো। ওরা ফিরে এলে দেখিও। বলো তোমার কিছু করার উপায় ছিল না। যদি মনে করো তবু তোমাকে ওরা সন্দেহ করতে পারে, তাহলে–আমার একদম সে ইচ্ছে নেই, কিন্তু যদি তুমি তা চাও–এক বাড়ি মেরে তোমাকে মেঝের ওপর ফেলে রেখে যেতে পারি। (খয়ের প্রবলভাবে আপত্তি জানায়) বেশ! বেশ! আমার কোন ইচ্ছে নেই। ওরা তোমাকে অবিশ্বাস না করলেই হলো!

(দ্রুত বেরিয়ে যায়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিভাগীয় সেমিনার। সরু টেবিল বা বেঞ্চিতে বই রেখে ছেলেমেয়েরা পড়ছে। মঞ্চের পেছনের দিকে পাতা টেবিলের ওপর বই রেখে দর্শকদের দিকে পেছন দিয়ে বসে একটি মেয়ে পড়ছে। ডান পাশের টেবিলের এক প্রান্তে, মঞ্চের একেবারে সম্মুখ ভাগের কোণের কাছে বসেছে তারেক। তার উত্তরে বসেছে জনৈক ছাত্র। মঞ্চের বাঁ কোণে একটা কাঠের পার্টিশন কোনাকুনিভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনে টেবিলে বসে পড়ছে খয়ের। মীনা প্রবেশ করে। সবটা ঘর এক নজর জরীপ করে নিয়ে গটগট করে গিয়ে অন্য মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হাতের খাতা বই সশব্দে টেবিলে রাখে। সকলেই টের পায়। মীনা বসে। তারেক অতি মনোযোগের সঙ্গে সামনে বই খুলে রেখে মাথা কাত করে মীনাকে দেখতে থাকে। মীনা আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তারেককে দেখে। তারেক তাড়াতাড়ি বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। মীনা উঠে দাঁড়ায়। একটা খাতা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে তারেকের দিকে এগিয়ে যায়। যত কাছে এগিয়ে আসছে তারেকের মাথা ততই নীচু হতে হতে একেবারে বইয়ের সঙ্গে নাক লেগে যাবে। তখন মীনা একেবারে তারেকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের খাতাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে।]

মীনা। এই নিন। আপনার খাতা ফেরৎ নিন। ধন্যবাদ!

তারেক। খাতা আমার নয়। আমাকে অযথা ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

মীনা। খাতা আপনার কাছ থেকে নিয়েছি, আপনাকেই ধন্যবাদ দেব। এখন আপনাকে হাতের কাছে পেয়েছি, যা বলবার আপনাকেই বলতে পারি।

তারেক। না না, তা বলবেন না কেন?

মীনা। যখন আপনার বন্ধুকে সামনে পাব তখন তাকেও কিছু শোনাবার ইচ্ছে রাখি।

(ঘুরে গিয়ে মীনা নিজের জায়গায় বসে। তারেক আস্তে আস্তে খাতাটা হাতে তুলে নেয়। আড়চোখে মীনার ওপর লক্ষ্য রাখে, এদিকে খাতার পাতা উলটে-পালটে দেখে। যা খোঁজে, পায় না। আবার পাতা উলটায়। আবার। বারবার পাগলের মতো খাতার পাতা উলটে-পালটে খোঁজে। লক্ষ্যও করে না যে ওর এই ব্যস্ততা দেখে মীনা উঠে এসেছে।)

মীনা। আপনার কি কিছু খোয়া গেছে?

তারেক। না না। ছি ছি। কি যে বলেন!

মীনা। মনে হচ্ছে খাতার মধ্যে মূল্যবান কিছু রেখেছিলেন, এখন খুঁজে পাচ্ছেন না।

তারেক। না না। খাতার মধ্যে মূল্যবান কিছু রাখতে যাব কেন?

মীনা। আমরা রাখি। টাকা-পয়সা আমরা হামেশা বই-খাতার মধ্যে গুঁজে রাখি। কিছু চুরি গেছে বলে সন্দেহ করেন না কি?

তারেক। তওবা, তওবা। আপনি এসব কি বলছেন! তা ছাড়া এ খাতা আমার নয়। এ খাতার মধ্যে আমি টাকা-পয়সা গুঁজে রাখতে যাব কেন?

মীনা। অন্য কিছু, আরো দামী অন্য কিছু?

তারেক। না না। আমি কিছু রাখিনি। এ খাতার কিছুই আমার নয়। এর বাইরের মলাট, ভেতরের কাগজ, হাতের লেখা, ভাষা কিছুই আমার নয়। আমার কিছু খোয়া যায়নি।

মীনা। শুনে অন্তত একটা দুশ্চিন্তা কাটল। কিন্তু আপনি যে আপনার বন্ধুর মতো নন তা কে জানে? সামনে বিনয় প্রকাশ করে পরে আদালতে গিয়ে নালিশ রুজু করবেন না তো?

তারেক। সোহরাব কি করেছে?

মীনা। নামটা পাল্টে রাখতে বলবেন। এত নীচ আর কুটিল যার স্বভাব, সোহরাব নাম তাকে মানায় না।

তারেক। কি করেছে? রুস্তম, মানে ইয়ে, সোহরাব কি করেছে?

মীনা। রুস্তম কে?

তারেক। কেউ নয়, কেউ নয়। মানে, আপনি নাম পাল্টাতে হুকুম করায়, সাদৃশ্যবশতঃ ওটা বেফাঁশ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মীনা। হুম্। আপনার বন্ধু ক্ষেপে গিয়েছেন। আপনার দৌলতে ওঁর খাতা আমার হাতে এসে পড়ায় উনি ক্ষেপে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সব জেনেশুনেও শুধু অপদস্থ করবার জন্য খাতা চুরি গেছে বলে থানায় ডায়রী করিয়ে এসেছেন। এতেও মনের ক্ষোভ মেটেনি। তক্কে তক্কে ফিরেছেন। প্রথম সুযোগেই আমার খাতাগুলো চুরি করেছেন। মেহেরবানি করে ওঁকে একবার বলবেন, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়।

তারেক। ও আপনার খাতা চুরি করেছে?

মীনা। চুরি করেছেন না তো কি আমি ওনাকে উপহার দিয়েছি? আপনি কোথায় চল্‌লেন?

তারেক। আমি সোহরাবকে ডেকে নিয়ে আসি।

মীনা। বেশ যান। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। যদি না আসতে চায়, আমাকে এসে বলে যাবেন কোথায় গেলে ওঁকে পাওয়া যাবে। আমি নিজেই যাব।

(তারেক মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায়। মীনা নিকটতম চেয়ারে বসে পড়ে। ভাবে। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ায় খয়ের।)

খয়ের। আমি একটা কথা বলব?

মীনা। আপনি?

খয়ের। মানে আপনার খাতাগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারতাম।

মীনা। কি বলতে পারতেন? এ বিষয়ে আমার কিছু জানতে বাকী আছে বলে আমি মনে করি না।

খয়ের। মানে, আপনার খাতা যে সত্যি সত্যি চুরি গেছে, সে বিষয়ে আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না।

মীনা। আপনি সন্দেহ প্রকাশ করবার কে? আমি বলছি চুরি গেছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়? আপনি কি মনে করেন যে আমি খাতা আঁচলের নীচে লুকিয়ে রেখে, মুখে রটিয়ে বেড়াচ্ছি যে আমার খাতা চুরি গেছে?

খয়ের। কিন্তু খাতা সত্যি সত্যি সোহরাব চুরি করেছে কি না সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিল।

মীনা। যে চুরি করেছে তার নিশ্চয়ই বলবারও কিছু রয়েছে। কিন্তু আপনি তার হয়ে জবানবন্দী দাখিল করতে চাইছেন কেন? আপনিও তার বন্ধু না কি?

খয়ের। জ্বি না।

মীনা। কেন? এক হোস্টেলে থাকেন না? পুরুষ মানুষ নন?

খয়ের। এক ঘরে থাকলেও সবাই বন্ধু হয় না। সবাই মেয়ে হলেও হয় না, ছেলে হলেও হয় না। মিশাল হলেই যে হয়, তাও নয়।

মীনা। কি বলতে চাইছিলেন, বলেন।

খয়ের। ধরুন, এখন একদিন, দৈব্যৎ আপনি সোহরাবের হাতে আপনার একটা হারিয়ে যাওয়া খাতা দেখতে পেলেন–

মীনা। একটা নয় পাঁচটা। মাছ নয়, পুঁকুর চুরি করেছে। ওঁকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

খয়ের। সেটা যে অন্যায় হবে আমি সে-কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে কোনো কথা শেষ করতে দিচ্ছেন না।

মীনা। বেশ।

খয়ের। ধরুন, একটা খাতা ওর হাতে এসে পড়েছে। হয়তো তার কাছে সেটা গচ্ছিত রেখেছে। হয়তো সেটা অন্য কোনো জায়গা থেকে সোহরাব উদ্ধার করে এনেছে। হয়তো নিজে সে খাতাটা এখনও খুলে দেখেনি। একটা অতি-নৈতিকতার মোহবশে হয়তো কোনো দিনই খাতাটা খুলে দেখবে না।

মীনা। কোন্ খাতাটা?

খয়ের। যে-কোনো খাতা। ধরুন সবচেয়ে অপরিষ্কার অগোছাল, অকাজের একটা খাতা। যার মধ্যে লেখা কম, কাটাকুটি বেশী।

মীনা। আমার রাফ্‌খাতাটা! পশু, পশু! অনুভূতিহীন বর্বর চোয়াড়ে চাষা! কেবল চুরি করে আশ মেটেনি। দশজনকে ডেকে দেখিয়েছে, নিজে বাহাদুরী নিয়েছে, একটা মেয়ে সম্পর্কে কুৎসিৎ কথা রটিয়েছে। সামনে পেলে ওঁকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব!

(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে রুমা। মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের ছাপ। ছুটে মীনার কাছে যায়)।

রুমা। মীনা, পালাও! ভালো চাও তো এখান থেকে এক্ষুনি পালাও।

মীনা। আমি পালাব? কি হয়েছে, পরিষ্কার করে বলো।

রুমা। এ পরিষ্কার করে বলার সময় নেই। দেরী হলে এক্ষুনি মহাকেলেঙ্কারী বেধে যাবে।

মীনা। তোমাকে এতবার এত অকারণে উদ্বেলিত হতে দেখেছি যে এখন কারণ না বললে আমি বিচলিত হতে পারছি না।

রুমা। সোহরাব তোমার খোঁজে এদিকে আসছে।

মীনা। সোহরাব?

রুমা। সোহরাব এমনভাবে আমাকে জেরা শুরু করল যে আমার হুঁশ বলতে কিছু বাকী ছিল না। কি বলতে কি বলেছি আল্লাহই জানেন।

মীনা। কি নিয়ে জেরা করছিলেন?

রুমা। ওর চিঠিটা নিয়ে। মানে, যে চিঠিটা ওর খাতার মধ্যে ছিল। ওই যে, যে খাতাটা শেষ পর্যন্ত তোমার হাতে এসে পৌঁছাল। তা আমি বললাম, সেটা মানে চিঠিটা, এখন তোমার কাছে নেই। মনে নেই, হট্টগোলের মধ্যে প্রোক্টর সাহেব সেটা ব্যাগে পুরে নিয়ে উধাও হলেন।

মীনা। সে-ও তোমার দৌলতে।

রুমা। শুনেই সোহরাব রেগে আগুন, তেলে বেগুনে। ফোঁস ফোঁস করে বলে উঠল যে তুমি নাকি ওর জীবন নষ্ট করবার জন্য পত্রসহ প্রোক্টরের কাছে নালিশ করেছ। তোমাকেও সে একবার দেখে নিতে চায়। ওই যে আসছে। আমার কথা তো শুনলে না, এখন ঠ্যালা সামলাও।

(রুমা একটা চেয়ার টেনে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে যায়। খয়েরও। একমাত্র মীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে। বেগে প্রবেশ করে সোহরাব। পেছনে তারেক। সোহরাব সারা ঘর দেখে। মীনার ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায়। মীনা এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সোহরাব আপনার সঙ্গে কিছু গুরুতর কথা ছিল। মেহেরবানি করে একটু বাইরে আসবেন কি?

মীনা। না। আপনি মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না। আপনার সঙ্গেও আমার কিছু গুরুতর কথাবার্তা আছে।

সোহরাব। বেশ। তাই হোক।

মীনা। বেশ।

সোহরাব। আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে আপনার আধুনিকতাটা একটা ভঙ্গী মাত্র। আসলে তার গভীরতা আপনার প্রসাধনের প্রলেপের চেয়ে বেশি নয়।

মীনা। আপনি যে মুক্তবুদ্ধির বড়াই করেন সেটাও একটা ভণ্ডামি। আদর্শের যে বুলি প্রচার করেন তা আগাগোড়া মেকি। রুচি, শিক্ষা ভদ্রতার যে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান, সেটা খুলে ফেললে ভেতর থেকে যা বেরিয়ে পড়বে তা ইতর, গ্রাম্য, নোংরা!

সোহরাব। এসব কথা আপনি বলছেন, আমাকে? আপনাকে আমি চিনি না? স্বাধীনা রমণীর ঢং কেবল বাইরে, ভেতরে সেই মধ্যযুগীয় অন্ধতা, মধ্যযুগীয় ভীরুতা, মধ্যযুগীয় সন্দিগ্ধতা!

মীনা। কেবল বাক্য, বাক্য, বাক্য! অন্যকে দিয়ে নিজের গরজ মেটাতে লজ্জা করেনি আপনার? খাতা পাঠাবার বেলায় নিজের বীরত্ব উবে গেল কেন?

সোহরাব। আমি আপনাকে খাতা পাঠিয়েছি?

মীনা। এক শ'বার পাঠিয়েছেন। আপনি ছাড়া তার মধ্যে অকথা-কুকথায় ভরা পত্র ঢুকিয়ে রাখবে কে? পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর আবার নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য পুলিশের কাছে ছুটে গেলেন কোন্ লজ্জায়? আপনি আসলেই বঞ্চক, নীচ, খল!

সোহরাব। সে চিঠি পড়ে আপনার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে ওই হাতের লেখা আমার নয়। ওই বাংলা ভাষা আমার নয়। পায়ের নীচে লুটোপুটি খাওয়া ওই প্রেমাবেগ আমার হতে পারে না। তবু কেন সে চিঠি প্রোক্টরের হাতে তুলে দিলেন? নালিশ করতে গেলেন কেন?

মীনা। এক শ'বার করব। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েদের খাতা চুরি করতে লজ্জা করে না আপনার?

সোহরাব। আমি খাতা চুরি করেছি? আমি চোর?

মীনা। আপনি চোর। আপনি অসংযমী। আপনি অসাধু। মিথ্যেবাদী, ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ!

সোহরাব। আর আপনি? আপনি কে? রঙ্গ করার বেলায় ঝুনো, কিন্তু নালিশ করার বেলায় কচি খুকি। কেউ পত্র লিখেছে তো হয়েছে কি? কপালে কলঙ্কের সীলমোহর এঁকে দিয়েছে? বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেছে? আপনাকে হরণ করেছে? কেঁদে কেঁদে নালিশ করতে গেলেন কেন?

মীনা। ষণ্ড! হস্তী! বর্বর! চণ্ডাল!

সোহরাব। আর কি ওই একটাই তো অস্ত্র! কাঁদুনে। কেঁদে কেঁদে জিততে চেষ্টা করুন।

(দু'জন মেয়ে এসে মীনাকে এক রকম জোর করে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যায়। ছেলেরা সোহরাবকে। পরবর্তী তিন চার জোড়া সংলাপ এক সঙ্গে চলবে)

খয়ের। সোহরাব! সোহরাব! এ তুমি কি করছ? আহ্ থামো না! থামো! এ তুমি কি করছ?

রুমা। মীনা! মীনা! এত বেসামাল হোসনে! এত চিৎকার করছিস কেন?

তারেক। সোহরাব! সোহরাব! পাগল হয়ে গেলে না কি? কাকে কি বলছ না বলছ একেবারে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ না কি?

সোহরাব। ওঁর মতো মহিলার সঙ্গে সংযত ব্যবহার করার কোনো সংগত কারণ আমি স্বীকার করি না। উনি কোমল নন, নম্র নন, লাজুক নন। উনি রীতিমতো মার-মুখো, দাংগাকাঙ্ক্ষী, ঘাতকী!

তারেক। আহ্ কী করছ। রাগলে তোমার। কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

খয়ের। মিস মীনা মিনহাজকে ও এসব কথা বলতে পারছে।

সোহরাব। কে? কে বলেছে মেয়ে। ইনি নিশ্চয়ই দেবতা। দেখ, দেখ, তাকিয়ে দেখ একবার! চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে! মেয়ে নয়, অগ্নিগিরি! অগ্নিগিরি!

মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলে কোনো মেয়েকে প্রকাশ্য স্থানে এসব কথা বলতে পারে, কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

মীনা। কৃষক! কৃষক! শেখেনি, এখনও শেখেনি মেয়েদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়। ভাষার ওপর লাগাম নেই। শরীরের ঝোঁক সামলাতে জানে না। মনে হয় যেন সত্যি সত্যি গায়ে হাত ওঠাবে। পশু! পশু!

রুমা। আহ্, তুই থাম না! তুই কি ওকে মারতে চাস না কি?

মেয়ে। একবার সোহরাবের কথাগুলো শোনেন। গায়ে ফোস্কা পড়ে যেতে চায়।

মীনা। থাকবে না। থাকবে না। এত দর্প থাকবে না। সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে হবে। করবে করবে। বিলাপ করবে। দেরী নেই। দু'হাত তুলে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করবে। দেখবো। সেও আমি দেখবো। সবাই দেখবে!

(সোরগোল বেশ জমকালো আকার ধারণ করে। এমন সময় সাদা-প্যান্টসার্ট জুতো পরে, হাতে ভাংগা ব্যাট নিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে খালেদ। চীৎকার করে বলে–।

খালেদ। চুপ। চুপ। সবাই চুপ কর। একেবারে বাজার বসিয়ে ফেলেছে। চুপচাপ পড়তে বসে যাও। প্রোক্টর আসছেন।

(সবাই তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে পড়তে বসে যায়। বই খাতা সামনে মেলে ধরে। প্রোক্টর প্রবেশ করে চারদিক দেখেন। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। নীরবতা।)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অনেক রাত। সোহরাবদের ঘর। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে গভীর মনোযোগ দিয়ে সোহরাব একটা খাতা পরীক্ষা করছে। হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, পাশে স্পন্জ ও এক গ্লাস পানি। পাঠোদ্ধারের সাধনায় এমন গভীরভাবে নিমগ্ন যে—সব সময়ে সকলের কথা পুরোপুরি বুঝে উঠবার অবসর পায় না। তারেক সোহরাবের তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে এদিক-ওদিক থেকে উঁকি মেরে খাতাটা পড়তে চাইছে। খালেদ ভাঙা ব্যাট আন্দোলিত করে ঘনঘন উত্তেজনা প্রকাশ করছে এবং সোহরাবকে প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে।]

খালেদ। কে? আমার ব্যাট এ-রকম করছে কে? দুপুর বেলা থেকে জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু এখন অবধি কোনো সদুত্তর পাইনি। আমার ব্যাট কে ধরেছিল?

সোহরাব। আমি।

খালেদ। তুমি? কেন? তুমি ক্রিকেট-ব্যাট ধরতে গিয়েছিলে কেন?

সোহরাব জরুরী প্রয়োজন পড়েছিল।

খালেদ। তোমার জরুরী প্রয়োজনে তুমি আমার ক্রিকেট ব্যাট ধরতে গেলে কোন্ আক্কেলে। জীবনে কখনও এর আগে ক্রিকেট-ব্যাট ধরেছিলে? এ তোমার মশারীর ডাণ্ডা না নৌকার বৈঠা যে জরুরী অবস্থায় যেমন করে পার ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে পারলেই কেল্লা ফতে। দেখ তো কি করেছ?

(ব্যাটটা সোহরাবের মুখের সামনে ঠেলে দেয়। সোহরাব ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতের খাতার ওপর থেকে সরিয়ে ব্যাটের ভাঙা মাথার ওপর তুলে ধরে।)

সোহরাব। ভেঙে গেছে।

খালেদ। এতক্ষণ পর তা উপলব্ধি করেছ? এ-রকমভাবে তুমি ব্যাট ভাঙতে পারলে কি করে?

সোহরাব। খেলতে খেলতে। কেন খেলতে খেলতে ব্যাট ভাঙে না? কত নম্বর টেস্ট ম্যাচে কোন্ মাঠে কোন্ বোলার কার ব্যাটের কোণা উড়িয়ে দিল মুখস্থ করে রাখনি?

খালেদ। এ্যাঁ! এ অশিক্ষিত ছেলে বলে কি? বল মারতে গিয়ে ব্যাট এই রকমভাবে ভাঙে? ক্রিকেট-ব্যাট চালাচ্ছিলে, না গদা ঘোরাচ্ছিলে? বল্‌তো বল্, মানুষের মাথা ফাটালেও ব্যাটের দশা এ-রকম হয় না!

সোহরাব। তাও চেয়েছিলাম। কিন্তু দরকার হয়নি।

খালেদ। তোমার আজকাল কি হয়েছে বল তো? বরাবর থাকতে পড়াশুনা নিয়ে, এক রকম ভালই ছিলে। বই-পুস্তকের চারকোণা ছোট ছোট দুনিয়া, তার মধ্যে নড়াচড়া করতে। বড়জোর বেরিয়ে এসে নিজের মাথার গোলাকার জমিতে চরে বেড়িয়েছ। সুখে ছিলে। মাঝখানে হঠৎ আবার ক্রিকেট অভ্যাস করার খেয়াল মাথায় চাপল কেন? জানো, তোমার হাতে ক্রিকেট-ব্যাট একটা আত্মঘাতী অস্ত্রের সমান? এ বস্তু হাতে পেয়ে তুমি যে ক্ষেপে যাবে সে তো স্বাভাবিক! নিজ মুখেই বলছ মাথা ফাটাতে চেয়েছিলে।

সোহরাব। প্রথমে এক বাড়িতে তালাটা ভেঙে ফেললাম। ভেবেছিলাম দরকার হলে আর এক বাড়িতে মাথাটা ভেঙ্গে ফেলব।

খালেদ। এ দেখছি একেবারে ক্ষেপে গেছ। সেমিনারেও তোমার কাণ্ড দেখে আমি একেবারে হতভম্ব। আরেকটু হলে তো তুমি মেয়েটাকে এক রকম ধরে ফেলেছিলে!

সোহরাব। কাকে ধরতে চেয়েছিলাম? মিস মীনা মিনহাজকে? আমি? আমি মিস মীনা মিনহাজকে ধরতে চাইছি?

খালেদ। আরে সে ধরার কথা বলছি না। তুমি আরেকটু হলে একটা হাতাহাতি বাধিয়ে দিয়েছিলে।

তারেক। তুমি সত্যি সত্যি মিস মীনা মিনহাজের খাতা চুরি করেছ? এটা কার খাতা? এ খাতা তুমি কোথায় পেলে? এটা কোন্ বিষয়ের খাতা? এর মধ্যে এতো কাটাকাটি কেন? পাতা ওল্টালে কি বুঝে? কি পড়তে পেরেছ?

খালেদ। কার খাতা এটা? মিস মীনা মিনহাজের? তুমি কোথায় পেলে?

সোহরাব। তোমার ব্যাটটা হাতের কাছে না পেলে উদ্ধার করতে পারতাম না।

খালেদ। কোন্ বিষয়ের খাতা? কি লিখেছে, পড় তো! লেখে কেমন?

সোহরাব। তোমার চিঠির জবাব পাঠিয়েছে। লিখেছে : সকল ক্রীড়ার শিরোমণি, আপনার নিপুণ পত্রাঘাতের মর্মপীড়ায় নির্যাতিত হয়ে

এখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছি। তারেক সোহরাব নিপাত যাক্! আপনি ছাড়া অন্য পুরুষকে মনুষ্য জ্ঞান করি না। ঘরের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর, এই দুই দানব বধ করে বন্দিনী রাজকন্যার প্রাণোদ্ধার করুন!

খালেদ। কোথায় লিখেছে দেখি?

সোহরাব। প্যাঁচানো লেখা। তুমি দেখে সবটা বুঝতে পারবে না।

তারেক। আমি সেই কখন থেকে দেখছি, এক বর্ণও উদ্ধার করতে পারিনি! আর তুমি এক নজর দেখেই সব ধরে ফেলবে?

(নেপথ্যে স্লোগান শুরু হয়ে গেছে : ছাত্র ঐক্য ইত্যাদি)

খালেদ। এ দেখছি কাটাকুটি। বুজরুকি ছাড়। সামনে আরো গুরুতর সংকট আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার।

তারেক। তুমি সত্যি পড়তে পারছ? এই জায়গায় কি লিখেছে পড় তো!

সোহরাব। ওটা অশ্লীল কথা, তোমাকে অন্য কোনো জায়গা পড়ে শোনাব।

তারেক। যে-সব জায়গা পড়া যাচ্ছে, সেগুলো তো একটাও এমন কিছু উত্তেজনাপূর্ণ নয়।

সোহরাব। তা তো হবেই।

খালেদ। ওরা ঠিক করেছে আজ রাত থেকেই ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু করবে। রাত কম হয়নি। যে-কোনো মুহূর্তে শুরু করে দিতে পারে।

তারেক। কি শুরু করবে?

খালেদ। হয়তো মশারীর ডাণ্ডা খুলে মাথার ওপর ঘোরাবে। হয়তো কেরোসিন ঢেলে বই-খাতা পুড়িয়ে দিতে চাইবে।

সোহরাব। অসম্ভব। এ খাতা আমি পোড়াতে দেব না।

খালেদ। কি আছে এই খাতার মধ্যে?

তারেক। আমি কিছুই পড়তে পারিনি। মানে, যে-সব জায়গা পড়তে পেরেছি তার মধ্যে কিছুই নেই।

খালেদ। এটা কোনো কাজের খাতা নয়। কোনো বিষয়ের খাতা নয়। নোট নয়। টিউটোরিয়াল নয়। এ-রকম খাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসার কোনো মানে হয় না।

সোহরাব। এমনিতে না দিলে সত্যি সত্যি মাথা ফাটিয়ে দিতাম।

খালেদ। সে খুব বাহাদুরীর কাজ হ'ত না! তোমার এই একটা হঠকারিতার জন্য আমাদের সবাইকে পস্তাতে হবে। নিজেদের মক্সুদ হাসেল করবার জন্য ওরা খাতা চুরি করে। আর তুমি? তুমি ডাকাতি কর ওদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে। যেভাবে মেরেছ

তাতে অস্ত্রটাকে আর ক্রিকেট-ব্যাট বলার মানে হয় না। ওদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে চুরি করা মাল লুট করে নিয়ে এসেছ। এইটে একটা আদর্শের জন্য আন্দোলন করা হ'ল?

সোহরাব। আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। যা পেরেছি তার জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে রাজী আছি।

খালেদ। তুমি কিছু পেয়েছ, তাই কিছু দিতে রাজী আছ। কিন্তু আমরা খেসারত দিতে যাব কেন? এই একটা খাতাকে উপলক্ষ করে ওরা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। হয়তো হয়েছে। হয়তো এই মুহূর্তেই ওরা লাঠিশোটা নিয়ে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সোহরাব। পরোয়া করি না।

তারেক। কি পেয়েছ বলতে পার? খাতা না হয় না দেখালে, কিন্তু বিষয়বস্তুটা কি বলতে পার?

সোহরাব। এখন বুঝতে পারছি মিস মীনা মিনহাজ খাতা চুরি যাওয়ার শোকে এ-রকম দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন কেন? আমি তখনও এটা পড়িনি। পরীক্ষার নোট কিংবা টিউটোরিয়াল খাতা খোয়া গেলে বাহ্যজ্ঞানহারা হবেন এমন মেয়ে উনি নন। এখন বুঝেছি। এ খাতাটা আমার কাছে এসে পড়েছে আশংকা করেই ক্ষেপে গিয়েছেন।

তারেক। তুমিও ক্ষেপে গিয়েছ।

সোহরাব। না। শুধু অস্বস্তি অনুভব করছি। নিজের নিরাপত্তার হাতিয়ার আবিষ্কার করতে পেরে আমার উল্লাসের অন্ত নেই। এই খাতা মিস মীনা মিনহাজের অরক্ষিত, অসতর্ক, অসহায় অন্তর্লোকের প্রতিচ্ছবি। তোমার সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে, প্রোক্টর সম্পর্কে অগস্তি গোপন চিন্তা এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। মিস মীনা মিনহাজ এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

তারেক। তুমি তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও?

সোহরাব। দর্প চূর্ণ করতে চাই। সাপের ফণা ঝাঁপির নীচে চেপে ধরে রাখব। খসে পড়া ঘোমটা তুলে কাল মুখ ঢেকে দেব। উদ্ধত উন্নত চিবুক কদমবুসির তাগিদে যেন আভূমি নত হয়ে আসে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

(বাইরে স্লোগান চড়তে থাকে)

খালেদ। আমি অন্য রকম প্রস্তাব করি।

সোহরাব। যেমন?

খালেদ। আমরা এখানে এক রকম আটক অবস্থায় আছি বলতে পার। ওরা দলে ভারি। তার ওপর সোহরাবের কাণ্ডকারখানায় নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিতও বটে। আমি প্রস্তাব করি যে, অকারণে আমরা ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না।

তারেক। আমি তোমাকে সমর্থন করি।

খালেদ। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের উচিত রমীজদের ঘরে গিয়ে একবার ক্ষমা প্রার্থনা করা, সোহরাবের কৃতকর্মের জন্য।

সোহরাব। রাজী আছি।

খালেদ। বেশ। তাহলে চল। যত দেরী হচ্ছে ততই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা গিয়ে ওদেরকে বলব যে, মতবাদের জন্য আমরা পরস্পরের বিরোধিতা করছি, কোন আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।

সোহরাব। চল। তবে তোমার ক্রিকেট-ব্যাটটা সঙ্গে নিয়ে যাব।

খালেদ। না। তুমি খাতাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সোহরাব। খাতা! খাতা আমি অন্য কোনোখানে রেখে যাব।

তারেক। তার মানে?

সোহরাব। ব্যাট ভেঙেছি, তালা উপড়েছি, মাথা ফাটিয়েছি, এসব অপরাধের জন্য মাফ চাইতে এক শ'বার রাজী আছি। কিন্তু খাতা ফেরৎ দেব কেন?

খালেদ। চালাকী রাখ। খাতা তোমাকে দিতে হবে।

(বাইরে স্লোগান)

তারেক। খাতা ওদের কাছে থাকতে পারে, কারণ ওরা খাতা চুরি করেছে। তা যদি না হয় তাহলে খাতা মিস মীনা মিনহাজকে ফিরিয়ে দিতে হবে। খাতা তোমার কাছে থাকবে কেন?

সোহরাব। তোমরা জোর করে আমার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে চাও? আমি তোমাদের ভালরকম চিনি। আন্দোলনের আদর্শের কথা ভুয়া, মালিকানা নিয়ে আইনবাজী ভুয়া। তোমরা চাইছ, খাতাটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করবে। মিস মীনা মিনহাজকে নিজেদের কব্জার মধ্যে আনবে। (সোহরাব লাফ দিয়ে ক্রিকেট-ব্যাটটা মুঠ করে ধরে ঘরের এক কোণে সরে দাঁড়াল) খবরদার। গায়ের দিকে এগিয়ে এসেছ কি ক্রিকেট-ব্যাট দিয়েই মুগুর ভাঁজব। আমি সব লণ্ডভণ্ড করে দেব। টেবিল, চেয়ার, মাথা, বাল্‌ব সব ফাটিয়ে চৌচির করে দেব। এ খাতা আমি কাউকে দেব না। খবরদার!

খালেদ। সোহরাব!

তারেক। খালেদ, খুলতে পারছি না। মশারীর ডাণ্ডাটা খুলতে পারছি না।

সোহরাব। তোমরা বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে। আমার সংগ্রাম আমি একা করব। তোমাদের কোনো সাহায্য চাই না। বেরিয়ে যাও। খবরদার আর এক পা এগিয়ে এসেছ কি, আমি সত্যি বলছি, যা থাকে কপালে, চোখ কান বন্ধ করে দড়াম করে লাগিয়ে দেব একটা!

(সোহরাব ব্যাট দিয়ে মারাত্মকভাবে বাতাস কাটে)

খালেদ ও তারেক। সোহরাব! সোহরাব!

(বাইরে প্রচণ্ড বেগে নতুন স্লোগান ফেটে পড়ে : 'গুপ্তচর! নিপাত যাক!' এবং 'প্রোক্টর! ধর ধর!' ঘরের তিনজন চমকে উঠে নতুন স্লোগান শুনে। স্লোগান থামতে না থামতেই দরজায় টোকা পড়ে। তিন বন্ধু এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। তারেক মশারীর রড উপড়ে ফেলেছে। দরজায় আবার টোকা পড়ে। সোহরাব ইশারা করে। তারেক দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়। ঢুকে পড়েন প্রোক্টর বদরুল হাসান। আরেকবার বাইরে স্লোগান শোনা যাবে।)

হাসান। সারা হস্টেল জেগে আছে। ব্যাপারটা কি? রাত বারটা বাজে। তোমরা শুতে যাবে না?

তারেক। আপনি এখানে এত রাতে কি করছেন স্যার?

হাসান। আমার আবার রাত-বিরাত। যেদিন থেকে তোমাদের দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছি, সেদিন থেকেই ঘুমের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। দিনে ঘুমালেও ঘুমাতে পারি কিন্তু রাতে ঘুমানো অসম্ভব। তোমরা সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন, আমি তখনও জেগে জেগে ফিরি।

সোহরাব। এসব করেন কেন? শুতে যাননি কেন? এই রকম অসময়ে হলে ঢুকতে গেলেন কেন? জানেন, ছেলেরা যদি টের পায় তাহলে যে-কোনো রকম একটা হাংগামা বাধিয়ে দিতে পারে।

হাসান। ছেলেরা ঠিকই টের পেয়েছে। স্লোগানের গর্জন শুনলে না? কিন্তু ওরা টের পায়নি যে আমিও টের পেয়ে গেছি।

তারেক। আপনি কি টের পেয়েছেন?

হাসান। যে আসলে ওরা রত্ন, রত্ন। যাকে বলে জুয়েল। গবর্নরের বক্তৃতা শুনে তোমরা হয়তো হেসেছ। কিন্তু আমি ঠিকই উপলব্ধি করেছি যে তোমরা সবাই আসলে এক একটা রত্নখনি। মণিমুক্তার

স্বভাবই ঝকমক করা। প্রাণবন্ত তরুণ একটু চিল্লামিল্লি করবেই। তাই বলে এরা আমাকে শারীরিকভাবে বিপন্ন করতে চাইবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।

খালেদ। করেন না ভাল। কিছু না হলে আরো ভাল। সব জুয়েল সমান নয়। তেজীগুলো জ্বলতে জ্বলতে ঠিকরে একটা আরেকটার গায়ের ওপর এসে পড়ে। আমরা সেই রকম আশংকা করছি। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের ঘর থেকে চলে যান।

হাসান। তোমাদের সম্পর্কে যে ওরা বলে, মিছে বলে না। তোমাদের কথাবার্তা সত্যি তেড়িয়া রকমের। তাহলেও তোমরাও জ্বলন্ত জুয়েলস্বরূপ, এ আমি অস্বীকার করিনে।

সোহরাব। আমাদের ঘরে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন, না কেবল আত্মরক্ষার তাগাদায় দরজায় ঘা দিয়েছিলেন?

হাসান। তোমরা পাগলও বটে, উদ্ধতও বটে। বিপদে পড়লাম কখন যে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হব! এমনি হস্টেলটা একবার টহল দিয়ে দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমাদের ঘরের সামনে এসে মনে হল ভেতরে কে যেন বিপদে পড়েছে। ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করছিল।

সোহরাব। আমি চীৎকার করছিলাম। কিন্তু সেটা ভয়ে নয় স্যার, ভয় দেখাবার জন্য।

হাসান। ওই একই কথা। ভাবলাম বিপত্তিটা মিটিয়ে দিয়ে যাই আর সেই সঙ্গে আমারও কিছু তদন্ত করার ছিল সেটাও না হয় চুকিয়ে যাব।

খালেদ। এত রাতে তদন্তে বেরিয়েছেন? আমাদের ঘরে?

সোহরাব। ভাল সময় নির্বাচন করেননি। তাড়াতাড়ি করুন। চারদিক অস্বাভাবিক রকম থমথমে মনে হচ্ছে।

(প্রোক্টর টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসেন। পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে একটা লিফলেট বার করে তার ভাঁজ খুলতে থাকেন।)

হাসান। তোমরা কেউ একজন স্বীকার করলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব। কথাটা এই লিফলেট নিয়ে।

সোহরাব। আপনি একেবারেই কোনো খোঁজ রাখেন না। কেন অনর্থক রাত জাগেন আল্লাহ জানেন। আপনি পড়ে বুঝতে পারেননি যে এ লিফলেট আমাদের নয়, ওদের। ওসব কথা কোনো দিন আমরা লিখি না, লিখতে পারি না লিখব না। আপনি যদি এখন সারারাত বসে বসে জেরা করেন তাহলেও আমরা বলতে পারব না—এ লিফলেট কে লিখেছে, কোত্থেকে ছেপেছে, কারা বিলি

করেছে। আপনি ভুল ঘরে এসেছেন। আমরা কাউকে ধরিয়ে দিতে পারব না। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। নিজের চেষ্টায় খুঁজে বার করুন।

হাসান। তোমার বলা শেষ হয়েছে? (ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নাড়েন) আমি সে-সব কথা জানতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি এই লিফলেটের উল্টোপিঠে বাংলা হস্তাক্ষরে যে পত্রটি লেখা আছে সেটা কার রচনা?

(সোহরাব টেবিলের অপর পাশে বসে হাতের খাতায় মনোনিবেশ করে)

সোহরাব। আপনি এ চিঠি কোথায় পেলেন?

হাসান। যাঁর কাছে পাঠিয়েছিলে, তিনি আমাকে দিয়েছেন। প্রেরকের নাম-ঠিকানা অনুসন্ধান করার জন্য।

সোহরাব। যদি তার হদিস পান?

হাসান। মিস মীনা মিনহাজ তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।

সোহরাব। আপনি তাঁকে এতটা সাহায্য করছেন কেন?

হাসান। তোমাদের সম্পর্কে যাতে জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায় তার জন্য। আমি ভাবতে পারিনি যে তোমরাও এতদূর অধঃপতনে যাবে। কেবল বড় বড় বুলি কপচাও আর ভেতরে ভেতরে শয়তানীর ডিপো। বুকে যদি এত ভাব উথলে উঠেছিল তাহলে ওঁর মুরুব্বির কাছে পয়গাম পাঠালে না কেন? সাহস করে মেয়ের কাছেই হাঁটু গেড়ে প্রস্তাব করলে না কেন?

তারেক। এসব কথা উনি বলেছেন?

হাসান। এক শ'বার বলেছেন। তা না করে কিনা চিঠি পাঠালে! তাও একজন বহন করলে, আরেকজনের খাতার মধ্যে ভরে। ভাষাটা আরো অচেনা। কার চিঠি, সে মেয়ে বুঝবে কি করে? সে চিত্ত স্থির করবে কি করে? হৃদয়ের মুখ কোন্ দিকে ফিরিয়ে রাখবে? একবার তার দশাটা ভেবে দেখেছ?

(পানির গ্লাস ও স্পঞ্জ নাড়েন)।

তারেক। আর সহ্য হচ্ছে না স্যার। আপনি যা হয় একটা স্থির করে ওঁকে জানিয়ে দিন।

হাসান। কি করে স্থির করব? যে-সব কথা তোমরা ওই পত্রে লিখেছ, সাহস করে তার সবটা আমি এখনও পড়তে পারিনি। যে মেয়েকে কেবলমাত্র দেখেছ, কিন্তু চেন না, কাছে এসেছ কিন্তু স্পর্শ করনি, যার অভিভাবকের সঙ্গে তোমার কোনো রকম কথাবার্তা হয়নি, যার সঙ্গে তোমার রুসমত হয়নি, আখ্‌ত

হয়নি–সেই রকম জলজ্যান্ত মেয়েকে এসব কথা তোমরা লিখলে কি করে? পত্রের প্রতি ছত্রে এত গনগনে কামনার শিখা, এত কাঁদা কাঁদা আবেশের ইংগিত, আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে তোমাদের মধ্যে কেউ এ কাণ্ড করতে পারে।

তারেক। মিস মীনা মিনহাজ যদি ভাবতে পারেন যে, এই পত্র আমার রচনা, আমি অস্বীকার করব না।

সোহরাব। তুমি? মিস মীনা মিনহাজ বিশ্বেস করবে যে ওসব কথা তোমার রচনা? ওই পত্র তোমার নিবেদন?

তারেক। আমাকে মনে করতে না পারলে তোমাকেও পারবে না। তোমাকে কি মনে করে, দুপুর বেলা সেমিনারে তার কিছু নমুনা আমরা দেখিনি?

সোহরাব। তুমি কিছু জানো না বলে এত কথা বলতে সাহস করলে।

(সোহরাব আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখে। প্রোক্টর ঘরের এদিক সেদিক থেকে এক একটা খাতা তুলে দেখেন, পাতা উল্টে ফেলে রাখেন।)

খালেদ। ও চিঠি আমার লেখা স্যার। হাতের লেখা আমার। মিস মীনা মিনহাজকে আপনি নিশ্চিন্ত মনে জানাতে পারেন যে ওই পত্রের প্রকৃত লেখক আমি। আমি আপনার সামনে পরীক্ষা দিতে রাজী আছি। আপনি আমার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

হাসান। সেই প্রমাণই খুঁজছি। সব ইংরেজী, ইংরেজী। (দু'-তিনটে খাতা তুলে সরিয়ে রাখেন) একটা খাতা পেলাম না যার মধ্যে বাংলা লেখা খুঁজে পাই। দেখি এটা! এক হ্যাঁচকা টানে সোহরাবের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নেন) এই তো বাংলা হাতের লেখা রয়েছে। ভাষার অন্তরঙ্গ রূপটাও ধরতে পারব। বেশ। বেশ।

সোহরাব। ওই খাতাটা আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিন স্যার!

হাসান। ফিরিয়ে তো দেবই। কিন্তু আপাততঃ নিয়ে যাচ্ছি।

(ব্যাগ খোলেন। সোহরাব এগিয়ে আসে।)

খালেদ। সোহরাব, বাড়াবাড়ি করো না!

তারেক। তুমি কি স্যারের কাছ থেকে জোর করে রেখে দিতে চাও নাকি?

সোহরাব। ও খাতা আমার নয় স্যার। ও হাতের লেখা স্টাডি করার কোনো দরকার নেই। আমার খাতা আমাকে দিয়ে দিন স্যার।

হাসান। আবোল-তাবোল বকছ। একবার বলছ এ খাতা তোমার নয়, তাই তোমাকে ওটা দিয়ে দিতে হবে। আবার বলছ ও খাতা তোমার, তাই আমি এ খাতা নিয়ে যেতে পারব না।

(খাতা এবং লিফলেট ভরে ব্যাগের মুখ বন্ধ করেন। সোহরাব মরিয়া হয়ে ছুটে সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। তারেক এবং খালেদ তাকে নিরস্ত করতে পারে না।)

হাসান। সোহরাব! ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও!

(ঠিক সেই মুহূর্তে 'চুপ রও' বলে একটা প্রচণ্ড চীৎকার করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এক বান্দা। লুঙ্গী গোঁচ করে পরা খালি গা। চোখ খোলা রেখে নাকে মাথায় মুখে আচ্ছা করে গামছা পেঁচিয়েছে। হাতে বাল্‌তি। চীৎকার শুনে ভয়ে সোহরাব, তারেক, খালেদ দৌড়ে ঘরের পেছনে চলে যায়। আগন্তুক 'বাতি নেবাও' বলে আরেক হুংকার ছেড়ে বালতির মাল সামনে ছুঁড়ে মারে। বাতি নিভে যায়। অন্ধকার।)

তারেক। স্যার, স্যার! আপনার কিছু হয়নি তো স্যার?

হাসান। কিছু হয়নি। তবে সারা গা কিৎ কিৎ করছে। মেথর ছোকরা এগুলো কি ঢেলে দিয়ে গেল?

খালেদ। ও মেথর নয়। নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী ছাত্র হবে স্যার। আমার মনে হয় না আপনাকে চিনতে পেরেছে। নিশ্চয়ই আমাদের টার্গেট করেছিল।

হাসান। হয়তো তাই হবে। কিন্তু বড় দুর্গন্ধ! সত্যি, ঢেলে দিয়ে গেল নাকি?

সোহরাব। আমাদের গায়ে পড়েনি। ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাসান। ওহ্! (দু'হাতে আশপাশ চাপড়ে পরীক্ষা করেন)।

সোহরাব। আপনি পড়ে গেছেন নাকি স্যার?

হাসান। হ্যাঁ। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়। কেউ ধাক্কা দেয়নি, কিন্তু চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম!

সোহরাব। তুলে ধরব, স্যার?

হাসান। না না, থাক থাক। তার কোনো দরকার নেই। রত্নের গায়ে ময়লা লেগে যাবে।

সোহরাব। আপনার ব্যাগ ঠিক আছে?

হাসান। সেইটেই যে কোন্ দিকে ছিটকে পড়ে গেল। একটু খুঁজে দেখ তো বাপুরা।

(তিন বন্ধু অন্ধকারে ধাক্কাধাক্কি করে খোঁজে। অতি উৎসাহের বশে জিনিসপত্র সশব্দে উল্‌টে-পাল্‌টে একাকার করে। একবার ভাল মতোন জট পাকায়।

তিনজনই একসঙ্গে এ ওর অঙ্গে পেঁচিয়ে টেবিলের নীচে আটকা পড়ে। সেই সময় হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে ও বাইরে প্রচণ্ড হল্লা শোনা যায়। স্লোগান শোনা যায়। দেখা গেল মঞ্চে প্রোক্টর নেই। তাঁর ব্যাগও নেই। তিনজনই টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে। তারেক ও খালেদ নাকে রুমাল চেপে ধরে।)

সোহরাব। খুব ঘোল খাইয়েছেন আমাদের! খাতাসহ ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিয়েছেন।

তারেক। অত স্বার্থপরের মতো কথা বল না। উনি যা খেয়েছেন সেটাও খুব সুস্বাদু নয়!

সোহরাব। হুঁ।

(খালেদ সন্তর্পণে তার ব্যাটটা নোংরা বাঁচিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করে।)

তৃতীয় দৃশ্য

[ছাত্রাবাসের সভাকক্ষ। রঙ্গমঞ্চই বক্তৃতামঞ্চ এবং দর্শকমণ্ডলী শ্রোতৃবৃন্দ। দর্শকদের মধ্যে প্রথম সারিতে মেয়েদের দিকে রুমা, মীনা। ছেলেদের দিকে সোহরাব, খালেদ। এদিকে ওদিকে খয়ের, আফতাব। যখন পর্দা উঠবে তখন সভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে। মঞ্চে সভাপতি হলেন রমীজুদ্দীন। দু'পাশে দুটো বক্তার খুঁটি। শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হলে ঘণ্টা থামে। রমীজুদ্দিন গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ায়।]

রমীজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেরা! আজ আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি তা কারো অজানা নয়। পরীক্ষা আসন্ন। সময়ের বাতি নিবু নিবু। সিদ্ধান্ত নিতে যদি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করি তবে আমরা মেছমার হয়ে যাব। কর্তৃপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে হলে, সিদ্ধান্ত যেন ঐক্যবদ্ধ হয়, সেদিকে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। কেউ যদি গোপনে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় তবে আজকেই তাকে কব্জের মধ্যে আনার কোশেশ করতে হবে। স্লোগান আমরা চাই না যে ছাত্র-ঐক্যের তলদেশ দিয়ে ছাত্রদেরই একজন সুড়ং কাটুক।

আন্ধারের মধ্যে সলাপরামর্শ কেবল গান্দাকাজের জন্যই হয়। যার যা বলতে হয় প্রকাশ্য সভায় বলুন। বিরুদ্ধমত যদি পোষণ করেন তবে হিম্মতের সঙ্গে তা সর্বসমক্ষে জোর গলায় জাহির করুন। সহি-গলদ বিচারের ভার ছেড়ে দিন দশজনের ওপর। সম্মিলিত সাধারণ ছাত্রের কি রায় সেটাও জানুক। আমি বলি আমাদের সবকিছু ডেমোক্রেটিক হোক! (স্লোগান) সাধারণ ছাত্রের কি মত তা অনেক দিন আগেই আমরা বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা করেছি। যদি অন্য আওয়াজ থাকে, এখনি তা জাহির করুন। এখনই তার ফয়সালা হয়ে যাক। এখনই সবায় জানুক ছাত্রসাধারণ কত ঐক্যবদ্ধ। বিরুদ্ধমত ক্ষীণ বা অস্তিত্বহীন, ফাটল কত কাল্পনিক বা মিথ্যা। (দর্শকদের মধ্য থেকে সোহরাব হাত তুলে দাঁড়ায়) কে? সোহরাব সাহেব? আপনি কিছু বলতে চান?

সোহরাব। (চীৎকার করে) আমার মত জাহির করতে চাই।

রমীজ। অবশ্যই। অবশ্যই। আপনি মঞ্চে আসুন। সবাই আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না, পাওয়া দরকার। ভাইসব, সোহরাব সাহেব এবার আপনাদের কিছু নতুন কথা শোনাতে চান। এই আন্দোলনের উনি পক্ষে না বিপক্ষে, সে সংবাদ ওনার মুখে শুনে, আপনারাই তার মীমাংসা করুন। আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করুন। বলুন।

(স্লোগান)

সোহরাব। (উঠে এসে মঞ্চে দাঁড়ায়) আমি সভাপতিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এই আন্দোলনের সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে ওঁর দাবীর প্রমাণ কি? (সোরগোল) আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মৃদু বল প্রয়োগ আরম্ভ করেছেন কি? সকল সাধারণ ছাত্রকে কি জানিয়েছেন যে হোস্টেলে ঘনঘন বাতি নেভে কেন? নেভায় কারা? (গোলমাল) আপনারা কি মেয়েদের খাতা অপহরণ এবং ছেলেদের ঘরে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করা আরম্ভ করেননি? এটা কি বলপ্রয়োগ নয়? এটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের নমুনা? আপনারা কাদের প্রতিনিধি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হ'ল মৃদুকণ্ঠী সুবেশী অবলা মহিলারা। আপনারা একবারও তাঁদের মতামত যাচাই করেছেন? সেই মতের গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বর্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন। তাঁরা জাত হিসেবে সংখ্যালঘু হতে পারেন, তাঁরাই হলেন এই শ্রীহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত শোভা, আমাদের প্রাণহীন

জীবনের একমাত্র চাঞ্চল্য, আমাদের অসাড় চিন্তাজগতের দুর্লভ জীয়নকাঠি–

মীনা। (দর্শকদের মধ্য থেকে চীৎকারে করে ওঠে) জনাব সভাপতি, আমি কিছু বলতে চাই। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

(মৃদু সোরগোল)

রমীজ। অবশ্যই, অবশ্যই। সোহরাব সাহেব আপনি খামোশ হন। ভাইসব, মিস মীনা মিনহাজ, ছাত্রী বোনদের তরফ থেকে কিছু বলবেন। আপনারা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ওনার বক্তব্য শেষ হলে আমরা সোহরাব সাহেবের কথার জবাব দেব। আসুন মীনা মিনহাজ।

মীনা। (মঞ্চে আরোহণ করে বক্তৃতার ঢংগে) এই মাত্র যে ভদ্রলোক এক গাদা স্বাধীন মত প্রকাশ করে গেলেন আমি তার প্রত্যেকটির প্রতিবাদ করি। (করতালি) মেয়েদের সম্বন্ধে উনি যে-সব বক্রোক্তি করলেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। (শেম, শেম) পরীক্ষায় যোগদান করা সম্পর্কে যে সকল গর্হিত ধারণা প্রচার করতে চেয়েছেন, আমি তার কঠিন প্রতিবাদ করি। আমি ওঁর প্রতি উক্তি, প্রতি ভাব, প্রতি ইংগিতের প্রতিবাদ করি। আমি অবশ্যই নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দেয়ার বিরুদ্ধে। সব মেয়েই বিরুদ্ধে। তারিখ না পেছালে মেয়েরা পরীক্ষা বর্জন করবেই করবে।

(প্রচণ্ড করতালি ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে মিস মীনা মিনহাজ গটমট করে নেমে আসেন। মুখ লাল, তাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। থর থর করে কাঁপছেন। গোলমালের মধ্যে মিস মীনা মিনহাজের নামেও জয়ধ্বনি শোনা যাবে। ইতিমধ্যে মঞ্চে লাফিয়ে পড়ছে আফতাব। একটা খুঁটি আঁকড়ে ধরে, সকল গোলমালের ওপর গলা চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে।)

আফতাব। ভাইসব! বেরিয়ে গেছে। সত্য বেরিয়ে গেছে। আজ হোক কাল হোক সত্য প্রকাশ পাবেই। সত্য কখনো চিরকাল গোপন থাকে না। জাগ্রত পরিবেশ চুম্বকের মত তাকে বাইরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। মিস মীনা মিনহাজ তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে বাণী ব্যক্ত করেছেন, তা আমাদের ছাত্রী বোনদের সকলেরই অন্তরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অন্তরের কথা। প্রতিবাদের এই বাণীতে রচিত হবে দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের অগ্রগতির ইস্তাহার। (করতালি ও স্লোগান)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবরদস্তী করে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা চালু করে দিতে চান। তাতে আমরা কতল হই, তলিয়ে যাই, হারিয়ে যাই তাতে তাঁদের কিচ্ছু এসে যায় না। তাঁরা কেবল চান আইন রক্ষা করতে, নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিতে। আমরা জানি না, এদেশের আইনের অর্থ কি? নির্দিষ্ট অর্থ কি? নির্দিষ্ট তারিখের অর্থ কি? পরীক্ষার অর্থ কি? অন্যের দফারফা করার জন্য এদেশে আইনের নামে উত্তেজিত নয় কে? আবার প্রয়োজন পড়লে এই আইনেরই ঘাড় মটকায়নি কে? বারটা বাজায়নি কে? তাকে কাঁচকলা দেখায়নি কে? আইন কি কেবল আমাদের বেলাতেই অনড়? পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু ক্ষমতাশালীর কলেবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়নি কখনও? শুধু আমাদের পরীক্ষাই এক জায়গায় আটক পড়ে থাকবে? এটা কি এই মহাবিদ্যালয়ের আখেরী পরীক্ষা? এরপরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কি এই আশাই পোষণ করে? তবে আমরাও বলে রাখি আমরা কি আশা পোষণ করি। কর্তৃপক্ষের গোঁয়ার্তুমির গোড়া আমরা উপড়ে ফেলব। টিম্বাক্টুর এই পরদেশী ভাই-চ্যান্সেলরকে আমরা মোম্বাসা চালান করে দেব। (প্রচণ্ড করতালি ও স্লোগান) ভাইসব! নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা নেয়ার এই জিদ্ একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র! অপ্রস্তুত ছাত্র-সাধারণকে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা, মানে তাদের কাতারে কাতারে ফেল করান। ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারছেন আপনারা? একটু সূক্ষ্ম কিন্তু সামান্য চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন ভেতরে ভেতরে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে। এই ভাইস-চ্যান্সেলরের নিজের দেশে, টিম্বাক্টুতেও পরীক্ষা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে কর্তৃপক্ষ কখনোই মারামারি করেন না। ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। পাশের হারও সেখানে খুব সন্তোষজনক। সেই টিম্বাক্টুর লোক এখানে এসে নির্দিষ্ট তারিখের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন? যাতে আমরা কেউ পাশ করতে না পারি আর টিম্বাক্টুর সবাই পাশ করে করে আরো সামনে এগিয়ে যাক্। এ আমরা সহ্য করব না। তার আগে আমরা টিম্বাক্টুর ভাইস-চ্যান্সেলরকে মোম্বাসা চালান করে দেব। (করতালি ও স্লোগান) আর সভা-সমিতি নয়। স্লোগান-বক্তৃতার আর দরকার নাই। মিছিল-ইস্তাহার বন্ধ করুন। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ুন ডাইরেক্ট এ্যাকশনে। আমাদের ঐক্যে যারা ফাটল ধরাতে সাহস পায় ফাটিয়ে ফেলুন

তাদের। আর অপেক্ষা করছেন কিসের জন্য? বোনদের কাছে আমি করজোড়ে নিবেদন করছি তাঁরা যেন এখন এ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। এখন ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু হবে। এমন ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু হবে যে, তার কাছে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ কিছু নয়। (মেয়েরা চলে যেতে শুরু করবে) ভাইসব। আর আমরা বিলম্ব করছি কেন? সব বাতি নিবিয়ে দাও। চিঠি এসে গেছে সংগ্রামের। আপোসহীন সংগ্রামের। সর্বশেষ সংগ্রামের। চিঠি এসেছে প্রতি সংগ্রামী ছাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে। চিঠি এসেছে আগামী দিনের ছাত্রশক্তির বিজয়বার্তা বহন করে। বাতি নিবিয়ে দাও। ডাইরেক্ট এ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়! চিঠিকে মান! চিঠির জবাব দাও! চিঠি এসে গেছে, চিঠি! ছা আ ত ত্র ঐ ক্ ক্য অ!!

(প্রচণ্ড স্লোগান। করতালি। হট্টগোল। বাতি নিভে যায়। ভয়াবহ চীৎকার, গোলমাল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সকাল বেলা। মীনাদের বাড়ী। খয়ের মাথা নীচু করে একা একা বসে আছে। ভেতর থেকে প্রবেশ করে মীনা। অভিবাদন বিনিময় হয়।]

খয়ের। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

মীনা। হ্যাঁ। আপনি বোধহয় জানেন যে আমার কয়েকটা খাতা খোয়া যায়।

খয়ের। জানি।

মীনা। আমার খাতাগুলো কেউ চুরি করেছে।

খয়ের। আপনার পক্ষে সে-রকম মনে করা খুবই সংগত।

মীনা। আপনি অন্য রকম কিছু মনে করতে বলেন নাকি?

খয়ের। না।

মীনা। সেদিন আপনি বলছিলেন যে আমার একটা খাতা আপনি সোহরাবের হাতে দেখেছেন।

খয়ের। একটা খাতা সোহরাব সাহেবের হাতে গিয়ে পড়লেও তা থেকে এই অনুমান করা ঠিক হবে না যে তিনি খাতা চোর।

মীনা। একথাটা আপনি সেদিনও বারবার বলেছিলেন। তখনও অর্থ ভাল করে বুঝতে পারিনি। পরে গোলমালে পড়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পেলাম না। কথাটা আরেকটু ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য আপনাকে ডেকেছি।

খয়ের। পাঁচটা খাতা সরিয়েছিল অন্য লোক। এখনও তাদের হাতে চারটে খাতা মজুদ রয়েছে। পঞ্চম খাতাটা ঘটনাচক্রে ওদের হাত থেকে সোহরাবের হাতে চলে যায়।

মীনা। এটা কিসের খাতা ছিল? আপনি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন?

খয়ের। আপনার রাফ্‌খাতাটা।

মীনা। আমার রাফ্‌খাতা! আপনি জানেন, ওর মধ্যে কি ছিল?

খয়ের। একান্তভাবে যে খাতা নিজের, কখনোই যা অন্যকে দেখাবার নয়, এমন খাতায় আমরা সবাই অনেক কথা লিখে থাকি, যা মুখে কোনোদিন প্রকাশ করি না। নিজে লিখে গোপনে গোপনে নিজকে সেগুলো শোনাতে ভাল লাগে। আপনার রাফ্‌খাতায় আপনিও হয়তো সে-রকম কিছু করে থাকবেন।

মীনা। আপনি আর কি কি দেখেছেন?

খয়ের। সোহরাব সম্পর্কে এমন কিছু কথা ওর মধ্য থেকে বার করা যায় যা সাধারণভাবে ধারণাতীত ছিল। আমি মনে করি সোহরাব সেগুলো পাট করে বিহ্বল হয়ে পড়বে।

মীনা। ছি ছি! কী লজ্জার কথা। আপনি কেন সে খাতা আপনার কাছে রেখে দিলেন না? আপনাদের কাছ থেকে খাতা সোহরাব কি করে কেড়ে নিল?

খয়ের। সেও একটা এ্যাকসিডেন্ট। সব কথা আপনাকে বলা যাবে না। তবে বিশ্বাস করুন, আমি একেবারে অনুভূতিহীন যুবক নই। আপনার ওই খাতা পড়ে আমার নিজের জীবনচেতনার রূপও বদলেছে। যদি বন্ধুদের দ্বারা প্রহারিত না হতাম, সোহরাব যদি অতর্কিতে কঠিন অস্ত্র হাতে দরজা ভেঙে মাথার ওপর লাফিয়ে না পড়ত, আমি কিছুতেই এ খাতা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দিতাম না। লোকচক্ষুর লেলিহান শিখা থেকে একে রক্ষা করে শেষে একদিন আপনার হাতেই পৌঁছে দিতাম।

মীনা। কেন তা করলেন না? কেন নিজের কাছে রেখে দিলেন না? আমার কোনো দুঃখ ছিল না তাতে।

খয়ের। জানি। আপনি না বললেও একথা আমি জানতাম।

মীনা। যা খুশি তাই করতেন। কিন্তু সোহরাবকে কেন খাতাটা পড়তে দিলেন?

খয়ের। দিইনি, নিয়ে গেছে।

মীনা। নিজেরা দেখতেন। দেখে রেখে দিতেন। ইচ্ছে হলে পুড়িয়ে ফেলতেন। পুলিশকে দিয়ে দিতেন। প্রোক্টরকে দিয়ে দিতেন। যা খুশি করতেন। সোহরাবকে দিলেন কেন? আমার কি হবে? আমি কি করব! আপনি ভাবতে পারেন না আমার কত বড় সর্বনাশ হয়েছে।

খয়ের। আমাকে মাফ করবেন!

মীনা। ওই খাতা পড়ার পরও হয়তো সে আগের মতই অবজব মেশানো বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে। কিম্বা তার চেয়েও ভয়ানক লজ্জার কথা হবে–যদি ও অতর্কিতে ওর ব্যবহার পাল্টে দেয়,

হেসে কথা হয়, কথার মধ্যে ভাব মেশায়, করুণা প্রকাশ করে, ভালবাসতে চেষ্টা করে। আমি কি লজ্জায় মুখ দেখাব!

(চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভেঙে পড়ে। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। খয়ের তাকিয়ে দেখে। ব্যাগ হাতে প্রবেশ করেন প্রোক্টর বদরুল হাসান। খয়ের দাঁড়িয়ে পড়ে।)

হাসান। এ মেয়ে কাঁদছে কেন? তুমি কিছু করেছ?

খয়ের। জ্বী? না না স্যার, আমি কি, আমি কি, কি, কি, আমি, আমার জন্য নয়, স্যার!

হাসান। তুমি জানো কিসের জন্য কাঁদছে?

খয়ের। ওঁর যে খাতাটা সোহরাবের হাতে গিয়ে পড়েছে তার শোকে কাঁদছেন।

হাসান। মিস মীনা মিনহাজ! কান্না থামিয়ে মুখ তোল। যে মহামূল্যবান খাতার জন্য শোক করছ, সেটা নিয়ে এসেছি। (মীনা মুখ তোলে। প্রোক্টর চেয়ারে বসেন। খয়েরও। প্রোক্টর পোর্টফোলিও ব্যাগ খোলেন। খাতা বার করেন। খুলে দু'-এক পৃষ্ঠা কি দেখেন। খাতা সজোরে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন।) ধর, এই তোমার খাতা!

মীনা। আপনি কোথায় পেলেন?

হাসান। পরীক্ষা করে দেখব বলে সোহরাবের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

মীনা। সোহরাব সব দেখেছে?

হাসান। মনে কোনো দুঃখ রেখো না! তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেছে। যা খালি চোখে দেখা যায়নি তা ম্যাগনিফাইং গ্লাশ লাগিয়ে দেখেছে। কোন কথা কাটাকুটিতে ঢাকা পড়ে গিয়ে থাকলে ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে ঘষে সাফ করে দেখেছে।

মীনা। এখন এ খাতা নিয়ে আমি কি করব!

হাসান। তবে কি আমি ঘরে তুলে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখব? তোমাদের কাণ্ড দিন দিন যত দেখছি তত হতবাক হয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলাম, তুমি রুমার মত নও, তুমি আলাদা। তোমার একটা মর্যাদাবোধ আছে, আছে শুচিতা, সততা! এখন দেখছি তোমরা সব এক পাঁকালের মাছ।

খয়ের। এসব আপনি কি বলছেন, স্যার?

হাসান। তুমি চুপ কর ছোক্‌রা। (মীনাকে) কী সব কদর্য কথাই না খাতা ভরে লিখে রেখেছ! ভেবেছিলাম, কেবল ছেলেগুলোই বদমায়েশের হদ্দ। তক্কে থাকে সুযোগ বুঝে মেয়েদের কাছে

চিঠি চালান দেয়। তুমি কম নির্লজ্জ নও। সোহরাব তোমাকে চিঠি পাঠায় খাতার মধ্যে ভরে। চিঠির মধ্যে যে-সব কথা লিখেছে সে-সব পড়ে তুমি ঘুমুতে পারলে কি করে, আমি অবাক হয়ে যাই! আর তুমি! তুমি কি না সরাসরি খাতাকে খাতা লিখে তার কাছে চালান পাঠাচ্ছ। বাকী চারখণ্ডে কি লিখেছিলে, আল্লাহ জানেন, আমি সেগুলো এখনও উদ্ধার করতে পারিনি।

মীনা। আপনি এগুলো পড়তে গেলেন কেন?

হাসান। পড়েছি নিজের জ্ঞানচক্ষু ফোটাবার জন্য। সেটা ফুটে উল্টে বেরিয়ে পড়েছে এখন। তুমি আমাকে নিয়ে কার্টুন আঁক? আমি তোমার ইয়ার্কির পাত্র? একটা নয় একেবারে পুরো সিরিজ চিত্রিত করেছ। আমার যত রকম বেইজ্জতি কল্পনা করতে পার প্রাণভরে সেগুলো এঁকেছ। মেয়েমানুষ বলে যে তোমার কোনো লজ্জাশরম আছে তার কোনো ছাপ ওই ছবিগুলোর মধ্যে নেই। কেউ বুঝতে না পারে এই আশংকায় আবার প্রতি ছবির নীচে ছড়া কেটেছ। (খয়ের অসাবধানে হেসে ফেলে) কে? হাসল কে? তুমি। ছোকরা তুমি হেসেছ?

খয়ের। আমি হা হা হা হে হে হেসেছি? না না, স্যার আমি হে হে হে হা হা হা সি নি।

হাসান। বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও বলছি।

খয়ের। আমাকে উনি ডাকিয়ে এনেছেন। উনি বললেই চলে যাব।

হাসান। মীনা, ওকে এঘর থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে বল।

মীনা। আমি কাউকে চাই না। আমি কারো কথা শুনতে চাই না। চলে যান, আপনারা দু'জনেই চলে যান। আমি কারো কথা শুনতে চাই না।

(আসাদ ঘরে ঢুকেছে)

আসাদ। কারো কথা শোনার মত নম্রতা, ধৈর্য, সাহস সবই যে তুমি জলাঞ্জলি দিয়েছ সে-কথা আর অত চীৎকার করে জাহির করো না। দিনে দিনে নতুন নতুন গুণপনার পরিচয় দিচ্ছ। গতকালের ছাত্রসভায় তুমি যে কীর্তি করে এসেছ, অনেক রাতে, রুমা আমায় টেলিফোন করে তার সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে শুনিয়েছে। তখনই তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে আর ওঠাইনি। সকাল বেলা যখন কাজে বেরোই তখনও তুমি বিছানায়। তুমি কোন লজ্জায় ছাত্র সভায় ঘোষণা করে এলে যে পরীক্ষা দেবে না? পরীক্ষার তারিখ না পেছালে তুমি পরীক্ষা বর্জন করার মতলব আঁটবে, এ আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি। আস্কারা পেয়ে পেয়ে বেহায়াপনার চূড়ান্ত করছ। খাতা পারাপার কর, কদর্য চিঠিপত্র গ্রহণ কর, গুরুজনদের মস্করা করে ছবি আঁক! আর পরীক্ষার সময় এলে বল, এখন নয়, পরে। লজ্জা করে না তোমার? একেবারে বয়ে গেছ! মর না কেন, মর!

মীনা। ভাইয়া! তুমি, তুমি এসব কথা আমাকে বলতে পারলে? ভাইয়া! মরব! সত্যি মরব! এ মুখ আর তোমাদের দেখাতে চাই না!

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উঠে দাঁড়ায়। পায়ের ডগা দিয়ে লাথি মেরে মেঝের ওপর পড়ে থাকা খাতাটা অন্দর মহলের দিকে ঠেলে দেয়। বেরিয়ে যাবার আগে ঝুঁকে পড়ে তুলে নেয়। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। খয়েরের দিকে আসাদ চোখ তুলে তাকাবামাত্র খয়ের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতা।)

হাসান। তোমার বোনের কাণ্ডটা দেখলে?

আসাদ। তুমি আর কথা বলো না। আমি সবই শুনেছি। তুমি যা বল, আর যা কর, তার সবটাই ক্যারিক্যাচার। তোমার প্রোট্রেট হয় না। তোমাকে অবিকল বানালেও তা কার্টুনই হবে। মিছেমিছি আমাকে দিয়ে মেয়েটাকে শক্ত করে বকালে!

(প্রোক্টর একদৃষ্টিতে আসাদকে দেখেন। পোর্টফোলিও ব্যাগ তুলে নেবার আগে এদিক-ওদিক খাতাটা খোঁজেন। না পেয়ে রেগে ব্যাগ বন্ধ করেন। আরেকবার আসাদকে দেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান। চিন্তিত আসাদ সিগারেট ধরায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সন্ধ্যে রাত। সোহরাবদের ঘর। তিন বন্ধুই উপস্থিত। তিন জনেরই গালে, কপালে বা বাহুর কোনো কোনো স্থানে মোটা করে ব্যাণ্ডেজ লাগানো। সবাই যে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল তা বলে দিতে হয় না। বাইরে মুহুর্মুহু স্লোগানের হুঙ্কার। তিনটে বিকট বোমা বিস্ফোরণ-শব্দ। সোহরাব, তারেক, খালেদ ভয়ার্ত চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়। দরজার দিকেই তাকায়। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে রমীজ, আফতাব প্রমুখ। বাইরে আরো অনেকে। খয়ের অনুপস্থিত। আফতাবও অঙ্গে আহতযোদ্ধার চিহ্ন ধারণ করেছে। সবাই নীরব হলে–]

রমীজ। আমরা আপনাদের কাছে বকায়দা মাফ চাইতে এসেছি।

খালেদ। কেন?

রমীজ। গতরাতে সভার শেষে সাধারণ ছাত্ররা উত্তেজনার বশে আপনাদের কিছু প্রহার করে থাকবে।

খালেদ। শুনেছি আপনাদেরকেও কেউ কেউ করেছে।

রমীজ। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে এই রকমই হয়। আন্দোলন কোন্দলনে পরিণত হয়, দলাদলি দলাই-মলাইতে গিয়ে ঠেকে। এটা ছাত্র আন্দোলনের জন্য গৌরবজনক নয়। সে-জন্যই আমরা মাফ চাইতে এসেছি।

সোহরাব। যা চাইতে এসেছেন তা বুঝতে পেরেছি। যা দিতে এসেছেন এবার সেটা পেশ করেন।

রমীজ। মাঝখানে আর মাত্র একদিন বাকী আছে। আপনারা কি আপনাদের মত পরিবর্তন করেছেন?

সোহরাব। আপনারা করেছেন নাকি?

রমীজ। এটা খুবই দুঃখজনক। পরে এ নিয়ে আক্ষেপ করা নিরর্থক হবে। আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করে গেলাম। ভেবেছিলাম পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে আমরা একটা পরিপূর্ণ একতা অর্জন করতে পারব।

সোহরাব। পারবেন না।

রমীজ। বেশ। আপনারা কতদূর এগুতে পারবেন তা'কি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি? আমরা আরো কতদূর এগুতে পারব তার কিছু আভাস দিয়ে যাচ্ছি। হাতে সময় নেই। আমাদের প্রত্যেক সংগ্রাম এখন থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যক্ষভাবে হবে। চূড়ান্ত মীমাংসা হবে আগামীকাল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, আমতলায়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবেন!

সোহরাব। আসব।

রমীজ। সঙ্গে পুলিশ নিয়ে আসবেন না যেন।

সোহরাব। আমরা পুলিশ ডাকব?

(বাইরে স্লোগান : 'পুলিশ জুলুম ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। তারপর তিনটে বোমা ফাটবে। তারপর রমীজুদ্দিনের দল বেরিয়ে যাবে। স্তব্ধতা।)

তারেক। আর কি করবে? কি করতে চায়? দূর থেকে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছে। কাছ থেকে হস্তপদাদি চালান করেছে। ওরা আর কি করবে? কি করতে চায়? বলেছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যক্ষতর হবে।

(চারদিকে তাকায়)

খালেদ। (সোহরাবকে) আমাদের এই দুরবস্থার জন্য তুমি একা দায়ী! তোমার জন্যই আমাদের আজ এত রকম হেনস্তা।

সোহরাব। আমার জন্য?

খালেদ। তোমার হঠকারিতার জন্য। তোমার গলাবাজির জন্য। তোমার ডাণ্ডাবাজির জন্য। তুমি কেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে গেলে। আমরা পড়াশুনা করে যেতাম, পরীক্ষার দিন এলে দেখা যেতো কে কি করে। না, তুমি কিনা প্রথমে ওদের খ্যাপালে। তাতেও আশ মিটল না, গেলে ওদের একজনের মাথা ফাটাতে। ভাবলে খুব বাহাদুরির কাজ করে এলে! এখন মজা বোঝ। আমার অমন দামী ক্রিকেট-ব্যাটটার দফারফা করলে, এখন নিজেদেরও জান নিয়ে টানাটানি।

সোহরাব। বক্তৃতায় বলছে বটে যে ওরা খয়েরকে মারার প্রতিরোধ নিচ্ছে মাত্র, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওরাও জানে যে আমাদের শায়েস্তা করতে না পারলে ওরা কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে সুবিধা করতে পারবে না। আমি কিছু না করলেও ওরা আমাকে ছেড়ে দিত না। হামলা করতই। ওসব কথা রেখে দাও। এখন সামনে কি করলে পার পাওয়া যাবে, তাড়াতাড়ি তার একটা যুৎসই মতলব বার কর।

তারেক। আমি একটা কথা বলব?

সোহরাব। বলো।

তারেক। তুমি যদি মিস মীনা মিনহাজকে ও-রকমভাবে না চটাতে তাহলে আজ আমাদের এরকম দুর্দশা হ'ত না।

সোহরাব। মানে?

তারেক। ছাত্রদের ওপর মিস মীনা মিনহাজের একটা অদৃশ্য কিন্তু অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। তুমি যে তা না জানতে তা নয়। কিন্তু তোমার সকল জানার মধ্যেই এমন একটা ঔদ্ধত্য মেশানো থাকে যে সেও এক রকম অজ্ঞতা এবং অন্ধতার শামিল। সব জেনে শুনেও তুমি মিস মীনা মিনহাজের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে।

সোহরাব। কি করতে পারতাম? ও যে আচরণ করেছিল, করছিল, করত্–তার সঙ্গে মিল রেখে আমার তরফ থেকে যা যা করা হ'ত আমি তার বেশী কিছুই করিনি। দশ হাত দূর থেকে হামাগুড়ি মেরে ওঁর ফর্সা পায়ের কাছে পৌঁছে আঙ্গুলগুলো কামড়ে পড়ে থাকলে সেটা স্বাভাবিক হ'ত!

খালেদ। তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। তোমাকে পা কামড়াতে বলছে কে? কিন্তু তাই বলে তুমি গালাগালি করবে? মেয়েটাকে মারবার জন্য ছুটে যাবে?

সোহরাব। ও আমাকে গালিগালাজ করেনি? আমাকে মারবার জন্য ছুটে আসেনি?

তারেক। কি হ'ত তোমাকে মারলে? তোমার হাত-পা ভেঙে যেত? তুমি মরে যেতে?

সোহরাব। না। কিন্তু তুমি যে মরেছ তা আগেও জানতাম।

খালেদ। সবটাইতে তোমার বাড়াবাড়ি। গতরাতে বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালে। আশা করেছিলাম চোয়ালের জোরে এসপার-ওসপার করে ছাড়বে।

তারেক। মিস মীনা মিনহাজ একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। শুধু যদি ও কথাগুলো একটু লাইন মতো বলত। মেয়েদের প্রতি একটু আবেগপূর্ণ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করত! মিস মীনা মিনহাজের মন-মেজাজের সামান্য স্তবস্তুতি যদি করত! যদি–

সোহরাব। করিনি? বানিয়ে বানিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি যে–

খালেদ। হ্যাঁ বলেছ। এত বেশী বেশী বলছিলে যে বাচ্চা খুকিও বুঝতে পারত যে বানিয়ে বলেছিলে। সব, সব পণ্ড হয়ে গেল! একা মিস মীনা মিনহাজকে পক্ষে পেলে দেখতে আন্দোলনের নক্‌শা পাল্টে দিতাম!

তারেক। হয়তো চেষ্টা করলে এখনও তা হতে পারে।

সোহরাব। মানে?

তারেক। রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো উপায় দেখি না। মানে, সোহরাব চেষ্টা করলে হয়তো এখনও চাকা ঘুরে যেতে পারে।

খালেদ। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বল। আমার মাথায়ও কথাটা একবার এক ঝলকে এসেছিল। গোলমালের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক! সোহরাবকে চেষ্টা করতে হবে।

সোহরাব। আমাকে? এ্যাঁ! আমাকে?

তারেক। সোহরাবকে মিস মীনা মিনহাজের কাছে যেতে হবে।

খালেদ। এক্ষুনি যেতে হবে। এই মুহূর্তে ওকে যেতে হবে। নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।

তারেক। সোহরাব যাবে। যেমন করে কোনো পুরুষ মানুষ, কোনো রমণীর কাছে যায়। সকল দর্প দম্ভ সমূলে বিসর্জন দিয়ে। বিনম্র বিশুদ্ধ চিত্তে। করুণায় ভালবাসায় বিগলিত হয়ে।

সোহরাব। কভি নেহি। জ্যান্ত পুঁতে ফেল, তাও সই! কিন্তু আমি এই দাসখতে কিছুতেই দস্তখত করব না। কোনো মেয়ের জন্য আমি নির্মোক হব না, হব না। কোনো মেয়ের পদপ্রান্তে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আমি হাত কচলাতে কচলাতে কারো হৃদয় কচলাতে পারব না।

খালেদ। তোমাকে পারতে হবে। তোমার জন্য অপদস্থ হয়েছি। ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। আর আমাদের জন্য তুমি একটা হীরের টুকরো মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবে না?

(খালেদ ভাঙা ব্যাট হাতে তুলে নেয়। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। সবাই চমকে ওঠে। তারেক দরজা খুলে দেয়। খয়ের প্রবেশ করে।)

খালেদ। আপনি কি চান এখানে?

খয়ের। অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে বসে আপনাদের পরামর্শ শুনছিলাম। ওরা বিশ্বাস করে আমাকে পাঠিয়েছিল গুপ্তচর হিসেবে।

খালেদ। ঘরের ভেতরে ঢুকলেন কেন?

তারেক। প্রত্যক্ষতর কিছু করবেন নাকি?

সোহরাব। ওর সঙ্গে অন্যভাবে কথা বল! ও আমাদের পক্ষে। আমাকে অনেক রকমে সাহায্য করেছে।

খালেদ। ওহ্।

তারেক। আপনি বসুন।

খয়ের। না, বসবার সময় নেই। (তারেক ও খালেদকে) সোহরাবকে পাঠান। জোর করে পাঠান। কাজ হবে। দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাবে।

তারেক। আপনি এত কথা কি করে বুঝতে পারলেন?

খয়ের। মিস মীনা মিনহাজ আমাকে সকাল বেলা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সোহরাব। তোমাকে? উদ্দেশ্য?

খয়ের। একটা খাতার খোঁজ করতে। আমি সব দেখে এসেছি। উনি খুব কাতর। আঘাত করতে হয় এখনি করা দরকার।

সোহরাব। কে কাতর? কে কাকে আঘাত করবে? এ আরেক উন্মাদ। একে বার করে দাও এখান থেকে। তোমরা সবাই উন্মাদ। যে জগতে ভ্রমেও পদার্পণ করনি তারই মানচিত্র রচনা করে সব পথ-প্রদর্শক সেজে বসেছ! বেরিয়ে যাও। সব বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি কারো মুখ দেখতে চাই না। এ সংগ্রাম একা আমার। আমাকে এর রক্তাক্ত শিকারে পরিণত হতে দাও। জয়ী হতে হয় আমি একা জয়ী হব। কে চেয়েছে তোমাদের সাহায্য? কে চেয়েছে তোমাদের পরামর্শ শুনতে?

তারেক। পাগলামী করো না সোহরাব। আমরা সবাই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। কেবল এইটুকুই তোমার কাছে মিনতি, আমাদেরও একটু উপকার কর। মিস মীনা মিনহাজের কাছে যাও। ভেঙে পড়। ধরা দাও।

সোহরাব। চুপ কর। চুপ কর। দোহাই তোমাদের, তোমরা একটু কথা বন্ধ কর। তোমরা আমাকে পাগল করে দিতে চাও নাকি? তোমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর নাকি যে আমি যেতে চাই না। কে তোমাদের বলেছে যে আমি যাওয়ার জন্য ব্যগ্র নই, উৎকণ্ঠিত নই, তৃষিত নই? আমার আর-কটা তীর্থস্থান আছে যে আমি মিস মীনা মিনহাজ সম্পর্কে নিরুৎসাহ থাকব? আমি যেতে চাই না কারণ আমার যেতে দেরী হয়ে গেছে। যাবার এখন কোনো উপায় নেই, যেতে এখন আমার ভীষণ ভয়।

তাকের। তবু যাও, আমরা বাঁচব।

খালেদ। আমরা কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমাকে যেতে হবে।

সোহরাব। দু'দিন আগে তোমরা কেন একথা বললে না? দু'দিন আগে কেন তোমরা আমাকে জোর করে পাঠালে না? আমার সকল অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে তখন কেন পঙ্গু করে দিলে না? কত সহজে জয়ী হয়ে ফিরতে পারতাম! এখন যখন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত তখন তোমরা এসেছ পথ দেখাতে! মিস মীনা মিনহাজ এখন জানে যে আমি তার রাফ্‌খাতা আদ্যোপান্ত পড়েছি। জানে যে তার হৃদয়ের গোপন নিবেদন চোরের মতো বেআব্রু করে দেখে নিয়েছি। এখন আমি যতই আমার হৃদয়ের গোপন নিবেদনকে চীৎকারে করে ব্যক্ত করি না কেন, সে মনে করবে সব মিথ্যা, সব কৃত্রিম, সব কেবল দয়া দেখানো আর করুণা প্রকাশ করা! আমাকে সে সহ্য করতে পারবে না। যত কাছে ছুটে যাব তত বেশী আমাকে অপমান করবে, আমাকে তিরস্কার করবে। আঘাত করবে, তাড়িয়ে দেবে। হয়তো ভাইয়ের কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে আমাকে গুলি করে বসবে। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমি যাব না, যাব না, যাব না!

(বাইরে একটা বড় রকমের কোলাহল। স্লোগান! বিশেষ করে : পুলিশ জুলুম ধ্বংস হোক, স্বৈরাচারী পুলিশ-রাজ ধ্বংস হোক ইত্যাদি। খয়ের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। বাকী সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে। খালেদ ব্যাটটা মুঠ করে ধরে। তারেক মশারীর ডাণ্ডা। খয়ের হন্তদন্ত হয়ে আবার ঢোকে। বাইরে স্তব্ধতা।)

খয়ের। হলে পুলিশ ঢুকেছে। হয়তো দু'পক্ষেরই কিছু নেতৃস্থানীয় ছেলেকে গ্রেফতার করতে চায়। একটা ছেলে বলে গেল যে, সে স্বচক্ষে একজন অফিসারকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছে। অফিসারটি দারওয়ানের কাছে সোহরাবের নাম করে ঘর চিনিয়ে

দিতে বলেছিল। আমার মনে হয় আপনাদের আর বেশীক্ষণ এ ঘরে থাকা উচিত হবে না। অন্ততঃ সোহরাবের। আমি চলি।

(খয়ের ছুটে বেরিয়ে যায়। তিন বন্ধু হতবাক হয়ে বসে থাকে। বাইরে এক দম্‌কা প্রচণ্ড স্লোগান ওঠে। থামে। স্তব্ধতা। দরজায় টোকা পড়ে। সোহরাব ইশারা করে। তারেক ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরো পুলিশী পোশাকে ঘরে ঢোকে আসাদুজ্জামান। পেছনে ভীড় করে মাথা গলায় কৌতূহলী ছাত্রদল। তাদের মধ্যে রমীজ, আফতাবও রয়েছে।)

আসাদ। সোহরাব কার নাম? (স্তব্ধতা)

তারেক। (এগিয়ে গিয়ে) কোথায় যেতে হবে বলুন।

আসাদ। আপনার নাম সোহরাব?

খালেদ। আমার নাম সোহরাব।

আসাদ। আমি দেরী করতে পারছি না। আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। সত্যি বলুন কার নাম সোহরাব?

রমীজ। (এগিয়ে এসে) কি হয়েছে? আপনি সোহরাব, সোহরাব হোসেনকে চাইছেন? এঁর নাম সোহরাব।

(সোহরাবকে দেখিয়ে দেয়)

আসাদ। উহ্ বাঁচলাম। কেবল ভয় হচ্ছিল বুঝি আপনাকে ধরতে না পারি। দোহাই আপনার। আর এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। আপনি শিগ্‌গীর আমার সঙ্গে চলুন। আমি মীনার ভাই। আমাকে বাঁচান।

সোহরাব। সে কি, মীনার কিছু হয়েছে নাকি?

আসাদ। মিস রুমা জোয়ারদার বলে দিয়েছেন, আপনাকে যেন যে করে হোক সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

সোহরাব। কি হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলুন।

আসাদ। মীনা আত্মহত্যা করছে।

সোহরাব। আত্মহত্যা করছে, মানে কি? আত্মহত্যা করে ফেলেছে, না করতে চাইছে, না করতে চেষ্টা করছে–কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলুন।

আসাদ। আজ সকাল বেলা রাগের মাথায় একটু বেশী বকে ফেলেছিলাম। মা-মরা মেয়ে, কোনোদিন ওকে এত শক্ত করে–

সোহরাব। আপনি ও-রকম করে বক্‌তে গেলেন কেন? এখন কি হয়েছে তাই বলুন।

আসাদ। আমার শোবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি দরজা ভাঙতে চেষ্টা করেছিলাম। ভেতর থেকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের বুকে গুলি চালিয়ে দেবে।

সোহরাব। গুলি পেল কোথায়?

আসাদ। আলনায় আমার পিস্তল জোড়া ঝুলান ছিল।

সোহরাব। উনি আগে কখনও পিস্তল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন?

আসাদ। সেদিক থেকে ভয় বেশী। ওকে পিস্তল ছুঁড়তে আমিই শিখিয়েছি। হাতের টিপ খুবই ভাল। তাড়াতাড়ি চলুন।

সোহরাব। চলুন। সঙ্গে গাড়ী আছে?

আসাদ। আছে, চলুন।

(তাড়াতাড়ি করে খালেদ আর তারেক সুটকেস থেকে কয়েকটা কাপড় বার করে নিয়েছে)

তারেক। এই সিল্কের পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে নে। (পরাতে থাকে)

রমীজ। আমরা আসব স্যার? যদি কোনো সাহায্য করতে পারি।

আসাদ। আসুন, আসুন। অবশ্য আসুন। আপনাদেরই তো সহপাঠিনী। তবে গাড়ীতে সবার জায়গা হবে কিনা–

রমীজ। সেজন্য ভাববেন না। আপনারা রওয়ানা হয়ে যান।

খালেদ। স্লিপিং পাজামাটা বদলে নিলে হ'ত না? এই সাদা পাজামাটা পরে নে।

সোহরাব। গাড়ীর মধ্যে দিয়ে দে। এখন দেরী করিস না।

তারেক। পাঞ্জাবীর মধ্যে চিরুনী দিয়ে দিয়েছি।

আসাদ। চলুন।

[সবাই বেরিয়ে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[মীনাদের বাড়ি। রুদ্ধ দুয়ার। মঞ্চে প্রতীক্ষারত প্রোক্টর ও রুমা]

হাসান। মীনা! আমি প্রোক্টর বদরুল হাসান বলছি। যা বলি একটু মন দিয়ে শোন। তুমি আমাদের সকলের মাথা হেঁট করে দিয়েছো। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে রূপে-গুণে, ব্যবহারে-আচরণে তোমার মতো দ্বিতীয় মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। তুমি কোনোদিন কোনো আইন অমান্য করনি, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করনি, কোনো রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পাওনি। মিস রুমা জোয়ারদারের মতো

পরিবেশে বিভ্রম উৎপাদনের জন্য পোশাক বা প্রসাধনের কোনো রকম উগ্রতার প্রশ্রয় দাওনি। তোমাকে ভাল না বেসেছে কে? শ্রদ্ধা না করেছে কে? সেই তুমি আজ এ কি করতে যাচ্ছ? বেরিয়ে এস, লক্ষ্মী মেয়ে! বেরিয়ে এস। যদি আমার কোনো কথায় আহত হয়ে থাক তবে আমি তা প্রত্যাহার করছি। যদি ইচ্ছে হয় তুমি সব কার্টুন কাগজে ছেপে দিও। আমি চিত্ত সংযত রাখব। যে বেআইনি লিফলেটের অপর দিকে তোমাকে কেউ কিছু বিশেষ অন্তরঙ্গ কথা লিখে পাঠিয়েছিল, সেটা এখনও আমার কাছে আছে! তুমি যদি তোমার সংগ্রহে সেটা রাখতে চাও, বল, আমার সংগ্রহ থেকে উপড়ে এনে আমি সেটা তোমাকে দিয়ে যাব। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণাগারের মর্যাদা তোমার জীবনের চেয়ে বেশী নয়। মীনা, দরজা খুলে দাও। কোনো ছাত্রীর সঙ্গে কোনোদিন আমি এ-রকম করে কথা বলিনি। আজ বলছি অনেক দুঃখে। প্রোক্টরের চাকরি বড় দুঃখের। সরকারী পুলিশ আমাদের জব্দ করতে চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে অষ্টপ্রহর হুকুমের ওপর রেখেছে। ছাত্ররা আমার গাত্রে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছে। আর আমার সহ্য হয় না। আমি এমনিতেও স্থির করেছি পদত্যাগ করব। আমার এই শেষ অবস্থায়, তুমি আত্মহত্যা করে আমাকে আবার জীবননাশ করতে বাধ্য কর না। মীনা! দরজা খোল, দরজা খোল!

(ঘরের ভেতরে একটা পিস্তলের গুলির শব্দ ফেটে পড়ে। প্রোক্টর সভয়ে ছিটকে পেছনে সরে আসেন। 'মীনা! মীনা!' চীৎকার করে মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোহরাব। ছুটে ওকে ধরে আসাদ। চারদিক থেকে ভীড় করে দাঁড়ায় রমীজ, আফতাব প্রমুখ।)

আসাদ। (সোহরাবকে সামলাবার চেষ্টায়) এত বিচলিত হবেন না। ওটা কিছু নয়। যে গুলি নিজের গায়ে লাগবে তার সঙ্গে আর্তনাদও শোনা যাবে।

সোহরাব। ওহ্।

আসাদ। ওই ঘরের মধ্যে একটা কুলুঙ্গিতে টার্গেট প্র্যাক্টিসের নিরাপদ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। মীনাও মাঝে মাঝে ওটা ব্যবহার করে। এখন থেকে থেকে তার মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে।

সোহরাব। একটা পিস্তলে কতগুলো গুলি থাকে?

আসাদ। বেশী নয়। কিন্তু বাড়তি গুলি আমি কোথায় রাখি মীনা তা জানে। ঐ ঘরের মধ্যে দু'-তিন শ' রাউন্ড বারুদ আছে!

রমীজ। (দরজার দিকে এগিয়ে এসে) মিস মীনা মিনহাজ! আমি রমীজুদ্দিন, প্রেসিডেন্ট রমীজুদ্দিন বলছি। (ভেতরে কয়েক রাউন্ড গুলি চলে যায়) আপনি কি আমাদের প্রতি কোনো কারণে রুষ্ট হয়েছেন? যদি আন্দোলনের কোনো কর্মী আপনার প্রতি কোনো অসদাচরণ করে থাকে, শুধু আপনি তার নাম উল্লেখ করেন। আমরা তার চরিত্র সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেব।

আফতাব। কেবল কোনো ব্যক্তি নয়, সমগ্র আন্দোলনের তরফ থেকে নতজানু হয়ে আমরা বশ্যতা ঘোষণা করছি। দর্শন দিন, আন্দোলনকে ধন্য করুন। যদি আপনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান, আন্দোলনে জয়ী হয়েও আমরা চিরবঞ্চিতের দলে পরিণত হব। যে স্লোগান আপনার কণ্ঠে নন্দিত নয়, যে মিছিলে আপনার স্যান্ডেল মাটি ঘষবে না, যার বিজয়োৎসবে আপনার আঁচল উড়বে না সে রকম আন্দোলনে আমরাও শরীক হতে চাই না। রুদ্ধ দুয়ার লঙ্ঘন করে আপনি বেরিয়ে আসুন। হুকুম করুন। আপনার অঙ্গুলি হেলনে আন্দোলনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করুন। যদি আমাদের পরখ করে দেখতে চান, হুকুম করুন। তবু একবার বেরিয়ে আসুন। হুকুম করুন। বেরিয়ে আসুন।

(ভেতরে কয়েক রাউন্ড গুলি চলে যায়। সোহরাব দু'হাতে কান চেপে ধরে।)

সোহরাব। চুপ করুন। আপনারা সব চুপ করুন। সবাই এখান থেকে চলে যান। বেরিয়ে যান এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। গাদাগাদা অপরাধ করে এখন সবাই দরদে বেসামাল হয়ে উঠেছেন। আমার কাছে পর্যন্ত অসহ্য ঠেকছে। আপনারা দূর হন।

হাসান। তোমাকে একমাত্র এই কারণে ক্ষমা করা যায় যে কাকে কি বলছ এখন তা বোঝবার মতো তোমার মনের অবস্থা নয়। বলতে পার আমাদের কারোরই নয়।

সোহরাব। (প্রোক্টরকে) আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? কি ডিউটি দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন? দরজার ওপাশে এক ভদ্রমহিলা পিস্তল ধারণ করে আছেন। এপাশে কৌতূহলী জনতা। আপনি এখনও আশঙ্কা করেন নাকি যে এখানেও একটা নৈতিক অধঃপতনের সিচুয়েশন তৈরী হতে পারে? নিজের কাজের সুবিধার জন্য খাতা-চিঠি হাত করে একটা অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এখন কি শেষটুকু দেখে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন? (প্রোক্টর রেগে সরে যায়। রমীজ ও

আফতাবকে) আপনারা দু'জন অন্যত্র গিয়ে আন্দোলনের মহড়া দিন। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যে খাতা রচনা করার ক্ষমতা নিজের নেই, সে খাতা অপহরণ করে অন্যের এতবড় সর্বনাশ যেন আর কোনোদিন ডেকে আনতে না হয়। (রমীজের দল চলে যায়। আসাদকে) হ্যাঁ, আপনিও চলে যান। যে মুখে একবার মরতে বলেছেন, সে মুখেই আবার বাঁচতে বলবেন কি করে। চলে যান এখান থেকে।

(আসাদ চলে যায়। সোহরাব রুমার দিকে এগুতে থাকে।)

রুমা। থাক। আমাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার সঙ্গে একা একা দাঁড়িয়ে থাকবার মতো প্রবৃত্তি আমারও নেই। চলি। (প্রস্থান)

সোহরাব। (সামান্য স্তব্ধতার পর) শান্তি, শান্তি! এত কোলাহল থেকে আরেক কোলাহলের মধ্যে পড়ে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনাকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিছুতেই মনে হচ্ছিল না আপনার সঙ্গে এ জীবনে সহজভাবে কথা বলতে পারব। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? না, আরো জোরে বলব? অনেক লোকের মধ্যে কথা বলার অসুবিধা কি জানেন? নিজের মতো করে কথা বলা যায় না। নানা রকম অন্তরায় এসে আসল কথাগুলো আড়াল করে দেয়। নিজের ভূমিকায় বহাল থাকবার জন্য, অন্যকে ধোঁকা দেবার জন্য যা না বলবার তাও বলে ফেলি। খুব ভয় হচ্ছিল বুঝি আজো তাই হয়ে যায়! হয়তো যা বলব তাই উল্টা বুঝবেন! ভাগ্যিস বেটাদের ভাগাতে পেরেছি! মিস মীনা মিনহাজ! একটা সত্য কথা বলব? চটে গেলে আপনার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমারও থাকে না। কিন্তু সে-কথা আলাদা। গতরাতে ছেলেদের সভায় আপনি যে কীর্তি করে এলেন তার মতো এমন নীচ আর হাস্যকর কাজ আর হয় না। আপনি চলে আসার পর ছেলেরা মিটিং-এ আমাকে মেরেছে। আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে ধরে প্রহার করি। কিছু মনে করবেন না। যা বলার খোলাখুলি বললাম। অবশ্য এসব কথা বলার জন্য এখন আসিনি। বেঁচে থাকলে মারামারি করার অনেক সুযোগ পাব। আমি যা বলতে এসেছিলাম সে অন্য কথা। মীনা! মীনা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি সোহরাব, সোহরাব তোমাকে ডাকছি। মীনা! মীনা! আমি লিফলেটের রুস্তম নই, জলজ্যান্ত সোহরাব! তোমাকে ডাকছি, মীনা! মীনা! দরজা খোল! মীনা, দয়া করে আমার সব কথা শোন। আজ মিথ্যে কথা বলতে পারব না। হ্যাঁ, আমি

তোমার খাতা পড়েছি। না পড়লে জীবনের একটা মহত্তম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম। ভাগ্যিস পড়েছিলাম! অন্ধকার দুর্গের মধ্যে নিজকে আটক করে রেখেছিলাম। আত্মস্তুতির কারুকাজ করা বর্ম পরে সেই অন্ধকারে মহানন্দে ডুবতে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনে তোমার খাতার পাতা খুলে গেল। কী আনন্দ, দুর্গের পর পরিখাপ্রাকার শূন্যে মিলিয়ে গেল! যেই শুনলাম তুমি বিপন্ন, কঠিন বর্ম গলে অঙ্গে মিশে গেল। রুদ্ধ দুয়ার খুলে মুক্ত আমি বেরিয়ে এসে পাগলের মতো চীৎকার করে তোমাকে ডাকছি। মীনা! মীনা! সাড়া দাও। বেরিয়ে এস। রুদ্ধ দুয়ার খুলে বেরিয়ে এস। মুক্ত, জীয়ন্ত সোনার তুমি, বেরিয়ে এস। শাস্তি দাও, অপমান কর, উপহার দাও, প্রহার কর–তবু বেরিয়ে এস। যদি স্বেচ্ছায় না আস, আমি সবলে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব। এই রুদ্ধ দুয়ার আমি ভেঙে ফেলব। ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখি তোমার অঙ্গ প্রাণহীন, তাকেই গ্রহণ করব। একই অস্ত্রে নিজের দেহ তোমার পাশে স্থাপন করব। কিন্তু তবু তোমার কাছে আসব। আসবই আসব। আসব।

(পেছনে খট্ করে একটা শব্দ হয়। রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। ভেতর থেকে কেউ একটা পিস্তল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে মীনা। মুখ লাল, চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আস্তে আস্তে সোহরাবের দিকে এগুতে থাকে। সোহরাব দর্শকদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মীনার দিকে তাকায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বোধহয় মুখে বিড়বিড় করে বলে–মীনা! মীনা! মীনা।)

য ব নি কা

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট–১

জী ব ন প ঞ্জি

১৯২৫	খ্রি.	জন্ম ২৭ নভেম্বর। জন্মস্থান : মানিকগঞ্জ, ঢাকা
১৯৩৫	খ্রি.	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি। শিক্ষা-সূচনা : বগুড়া ও পিরোজপুর
১৯৪১	খ্রি.	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ
১৯৪৩	খ্রি.	আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এস. সি. পাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্স-এ ভর্তি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান
১৯৪৬	খ্রি.	বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার অর্জন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে *রাজার জন্মদিনে* নাটক মঞ্চস্থ
১৯৪৭	খ্রি.	দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. পাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রথম ছাত্রসভা হয়, তাতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বক্তব্য উপস্থাপন
১৯৪৮	খ্রি.	প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান
১৯৪৯	খ্রি.	খুলনা বি.এল. কলেজে ইংরেজি ও বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান লিলি মির্জাকে বিবাহ রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগে কারাবরণ
১৯৫০	খ্রি.	ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগদান
১৯৫০-৫১	খ্রি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগের ইংরেজির খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি
১৯৫০-৫২	খ্রি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার
১৯৫২-৫৪	খ্রি.	ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারাবরণ

১৯৫৪	খ্রি.	কারাগার থেকে বাংলা এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ
১৯৫৪-৫৫	খ্রি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার
১৯৫৫	খ্রি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী লেকচারার
১৯৫৬	খ্রি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে স্থায়ী চাকরি লাভ
১৯৫৬-৫৮	খ্রি.	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন এবং যুক্তরাজ্য সফর
১৯৬১	খ্রি.	প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে ঢাকায় রবীন্দ্র জন্ম-শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন
১৯৬২	খ্রি.	রিডার পদে পদোন্নতি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটক প্রযোজনা ও অভিনয়
১৯৬৩	খ্রি.	জাপানের টোকিওতে নাট্যসম্মেলনে যোগদান ঢাকা আর্টস কাউন্সিলের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ *দণ্ড* নাটকে অভিনয়
১৯৬৩-৬৪	খ্রি.	*কৃষ্ণকুমারী* ও *ভ্রান্তিবিলাস* নাটক প্রযোজনা
১৯৬৪	খ্রি.	সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ
১৯৬৫	খ্রি.	দাউদ পুরস্কার লাভ
১৯৬৬	খ্রি.	সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ
১৯৬৭-৬৮	খ্রি.	বাংলা টাইপ রাইটার 'অপটিমা মুনীর'-এর জন্যে উন্নতমানের কী বোর্ড উদ্ভাবন ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী সফর বাংলা ভাষা ও লিপি সংস্কারের নামে বিকৃতকরণের বিরোধিতা
১৯৬৮	খ্রি.	বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ
১৯৭০	খ্রি.	প্রফেসর পদে পদোন্নতি
১৯৭১	খ্রি.	কলা অনুষদের ডীন-এর দায়িত্ব পালন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সেমিনারে যোগদান অসহযোগ আন্দোলনের সময় পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী আলবদর-আলশামস্ কর্তৃক অপহৃত ও শহীদ হন।

তথ্যসূত্র : মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, ডিসেম্বর ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

পরিশিষ্ট–২

গ্রন্থপঞ্জি

নাটক ও একাঙ্ক নাটক

ক. মৌলিক

রক্তাক্ত প্রান্তর	:	১৯৬২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
চিঠি	:	১৯৬৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
কবর	:	(মানুষ, নষ্ট ছেলে ও কবর একাঙ্ক নাটক সহকারে) ১৯৬৬, চট্টগ্রাম, শাহীন বুক ক্লাব
দণ্ডকারণ্য	:	(দণ্ড, দণ্ডধর ও দণ্ডকারণ্য একাঙ্ক নাটক সহকারে) ১৯৬৬, চট্টগ্রাম, শাহীন বুক ক্লাব
পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য	:	(পলাশী ব্যারাক, ফিট কলাম, আপনি কে?, একতালা দোতালা, মিলিটারী ও বংশধর একাঙ্ক নাটক সহকারে) ১৯৬৯, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স

খ. রূপান্তর ও অনুবাদ

কেউ কিছু বলতে পারে না	:	(মূল : Bernard Shaw– You Never Can Tell) ১৯৬৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
রূপার কৌটা	:	(মূল : John Galsworthy– The Silver Box) ১৯৬৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
মুখরা রমণী বশীকরণ	:	(মূল : William Shakespeare– Taming Of The Shrew) ১৯৭০, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস
বৈদেশী	:	(ললাট লিখন, মহারাজ, জমা খরচ ও ইজ্জা, গুর্গণ খাঁর হীরা ও জনক সহকারে), রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ১৯৭৭, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
ওথেলো		(মূল : William Shakespeare– Othello) অসম্পূর্ণ কবীর চৌধুরী কর্তৃক সম্পূর্ণকৃত, ১৯৮১, ঢাকা, মুক্তধারা

গাড়ীর নাম বাসনাপুর	:	(মূল : Tennessee William– A Streetear Named Desire) অসম্পূর্ণ লিলি চৌধুরী কর্তৃক সম্পূর্ণকৃত, ১৯৮১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

গ. প্রবন্ধ ও গবেষণা

মীর-মানস	:	১৯৬৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস
তুলনামূলক সমালোচনা	:	১৯৬৯, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস
বাঙলা গদ্যরীতি	:	১৯৭০, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

রচনাবলি

আনিসুজ্জামান-এর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী* শিরোনামায় চারখণ্ডে মুনীর চৌধুরী রচনাসমূহ প্রকাশ করেন।

মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড	:	১৯৮২, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড	:	১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড	:	১৯৮৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড	:	১৯৮৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

মুনীর চৌধুরীর গ্রন্থ-বহির্ভূত এবং বিভিন্ন পত্রিকা/গ্রন্থে সংকলিত রচনাসমূহ

'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য : পাঠক-সাহিত্যিক সম্পর্ক, Bengali And Urdu– A Literary Encounter, Edited by Syed Ali Ahsan, 1964, Dacca, Bangla Academy

'The Writer for Relation To His Art And His Readers', Ibid

'রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৮, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ

'কবিতা ও নাটক' (অনুবাদ : মূল-টি. এস. ইলিয়ট) রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত থিয়েটার, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪, ঢাকা

'নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ', সুফি জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত, নজরুল প্রতিভা পরিচয়, ১৯৮৪, ঢাকা, সুফি জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন

'টেলিভিশন নাটক', রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, থিয়েটার, ষোড়শ বর্ষ ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৯০, ঢাকা

'Bengali as a Vehicle of Abstract Thought', The Daily Star, November 24, 1995, Dhaka

তথ্যসূত্র : মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, ডিসেম্বর ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

চিঠি • মুনীর চৌধুরী